এলেম
নতুন
দেশে

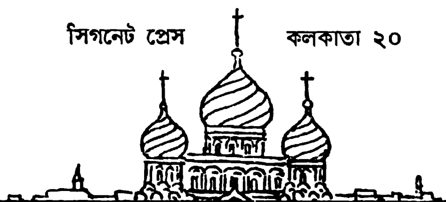


সোভিয়েট ইউনিয়ন : পোলান্ড : চেকোশ্লোভাকিয়া

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

এলেম নতুন দেশে

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০



প্রথম সংস্করণ

আষাঢ় ১৩৬৩

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

সমর ঘোষ

পীযূষ মিত্র

মুদ্রক

শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ

৩২ অপার সারকুলার রোড

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

দাম তিনটাকা

ভূমিকা

নভেম্বর ১৯৫৪। প্রায় আড়াই মাস পরে দেশের মাটিতে পা দিলাম। নানা জায়গা থেকে ডাক আসতে লাগল। সোভিয়েট ইউনিয়নে, পোল্যাণ্ডে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কী দেখে এলাম বলতে হবে।

বাইরে ঘোরবার সময় রোজকার ঘটনাগুলো আমি ডায়রীতে লিখে রাখতাম।

কাজেই যখন সবাই ধরে বসল, কিছু বলতে হবে—তখন দেখলাম নিজে গিয়ে জনে-জনে বলার চেয়ে যদি আমার ডায়রীটাকে দিয়ে বলাতে পারি, কাজ সহজ হয়। এই বই প্রকাশের এই হল ছোট্ট ইতিহাস।

এই বইতে তথ্য সাজিয়ে আমি কোনো কিছু প্রমাণ করতে চাইনি। সরজমিনে তদন্ত করে শোনা রহস্যের কিনারা করবার চেষ্টাও এতে নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশের বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে যে-দেশের যতটুকু চোখে পড়েছে, শুধু ততটুকুই এ-বইতে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে কিছু-কিছু বিচার-বিবেচনাও হয়তো এসে পড়েছে। তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। যেসব জিনিস খুঁটিয়ে দেখেছি, তা খুঁটিয়ে বলতে দ্বিধা করিনি।

এ বই পাঠকদের হাতে তুলে দিয়ে যদি মনে-মনেও একবার নতুন দেশ পরখ করিয়ে আনতে পারি, আমার শ্রম সার্থক হবে।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

এলেম
নতুন
দেশে

ভারত সরকার সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি সাংস্কৃতিক দল পাঠাচ্ছেন, তাতে আমাকেও যেতে হতে পারে। কথাটি আমি প্রথম জানতে পারি ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে দিল্লী থেকে লেখা প্রীতিভাজন এ. কাননের চিঠিতে।

অগাস্ট মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র খাস দপ্তর থেকে পাকা খবর এল—আমাকে যেতে হবে। তিন সপ্তাহের সময়। সোভিয়েট ইউনিয়নের দেশে-দেশে ঘুরে সংস্কৃতির আদান-প্রদান করাই হবে আমাদের উদ্দেশ্য। জানা গেল, ভারত সরকারের তরফ থেকে শিক্ষা দপ্তর, সংবাদ ও বেতার দপ্তর এবং বৈদেশিক দপ্তর—এই তিনটি দপ্তর মিলে রুশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় যাত্রীদলটি গঠন করেছেন।

আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শে রাজী হয়ে গেলাম।

অগাস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লী পেঁছিবার কথা। হঠাৎ খবর এল তার কয়েকদিন আগেই দিল্লীতে হাজির হতে হবে। আমার মুশকিলটা গিয়ে পড়ল আমার দর্জির উপর। কেননা গরম পোশাক সমস্তই আমাকে নতুন করে করিয়ে নিতে হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে কোনোরকমে জিনিস-গুলো পেয়ে গেলাম রওয়ানা হবার ঠিক মুখে। গায়ে দিয়ে দেখবারও আর তখন সময় ছিল না। ফলে, খুঁতগুলো যখন ধরা পড়ল তখন আমি মস্কোতে।

পাসপোর্ট আমার করাই ছিল। গেল বার চীন দেশ থেকে নেমন্তন্ন পাবার পর করিয়ে ছিলাম। তাই অন্তত খানিকটাও ঝকমারির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। ছুটোছুটি যে একেবারেই করতে হয়নি তা নয়। দু-একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হল। তাছাড়া শেষ মুহূর্তে দিল্লীর দপ্তরের তাগাদায় গোটাকতক ফোটোগ্রাফ তোলাবার জন্যে অনর্থক হয়রান হতে হল—ফোটোগ্রাফগুলো শেষ পর্যন্ত কোনোই কাজে লাগল না।

কলকাতা থেকে রওয়ানা হলাম ১৯শে অগাস্ট। স্টেশনে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের অনেকেই এলেন শুভযাত্রায় মঙ্গলকামনা ও প্রীতি জানাতে।

দিল্লী রওয়ানা হবার আগে যথানিয়মে সরকারী দপ্তরে তার করে-ছিলাম। সেই সঙ্গে পরম প্রীতিভাজন বিমান ঘোষকেও খবর পাঠিয়ে-ছিলাম। কিন্তু পরদিন রাত সাড়ে-নটায় দিল্লী পেঁছে এক বিমান ঘোষকে

ছাড়া স্টেশনে আর কাউকেই দেখা গেল না। সরকারী দায়িত্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই রাত্রে কোথায় যাওয়া উচিত তাও ঠিক করে উঠতে পারলাম না। বিমানবাবুও বললেন তাঁকে রেডিওর দপ্তর থেকে কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

অগত্যা বিমানবাবুর সঙ্গে তাঁর আস্তানা ওয়াই. এম. সি. এ-তে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। রাত বেশি হওয়ায় নৈশভোজনের পর্বটা রেস্তোরাঁতেই চুকিয়ে ফেলতে হল।

সেখান থেকে ফেরবার পথে পড়ে টাউন হল্। বিষ্ণুদিগম্বর জন্মতিথি উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে সেখানে সঙ্গীতের উৎসব চলেছে। কিছুক্ষণ গিয়ে বসলাম। সম্মেলনের কর্মকর্তারা, বিশেষ করে বিনয়চন্দ্রজী, আমাকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যেন একদিন আমি উৎসবে তবলা বাজাই। আমি ওঁদের জানিয়ে দিলাম অনেকদিন আমার অভ্যাস নেই, ওঁদের অনুরোধ তাই আমি রাখতে পারছি না।

পরদিন সরকারী মুলাকাৎ সারতে শিক্ষা দপ্তরে যেতে হল। দেখলাম দলের অন্য সদস্যরাও সেখানে হাজির। যেতে না যেতে একটি হল্-এ আমাদের ডাক পড়ল। আমরা বসে আছি। এমন সময় পণ্ডিত নেহেরু ঘরে ঢুকে একমুখ হেসে আমাদের অভিনন্দন জানালেন। একে-একে তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং তারপর হাস্যপরিহাসের ভিতর দিয়ে জানিয়ে দিলেন বিদেশে গিয়ে আমাদের কিভাবে চলাফেরা করা উচিত। আধ-ঘণ্টার উপর তিনি সেদিন আমাদের মধ্যে কাটালেন।

রাত্রে টাউন হল্-এর সঙ্গীত উৎসবে গেলাম। আজকের আকর্ষণ বড় কম নয়; রবিশঙ্কর ও তাঁর সহধর্মিণী অন্নপূর্ণা দেবী দ্বৈত সুরবাহার বাজিয়ে শোনাবেন। মাঝরাত্রে দুচোখ যখন ঘুমে জড়িয়ে আসছে, তখন দুজনের বাজনা শুরু হল। কী ভালো যে লাগল বলা যায় না। তারপর আবার পণ্ডিত রবিশঙ্করের একক সেতার-বাজনা। ঘুম আর ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু শোনবার লোভও কম নয়।

এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকদিন অভ্যাস নেই বলে আমি রাজী হইনি।

রবিশঙ্করের সেতার শুনব বলে টাউন হল্-এর খোলা মাঠে ভিড়ের মধ্যে লাউডস্পীকারের কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে বেশ একটা তন্দ্রার

আমেজ নিয়ে বসেছি, এমন সময় শুনলাম লাউডস্পীকারে ঘোষণা করা হচ্ছে : রবিশঙ্করের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করছেন কলকাতার জ্ঞান ঘোষ।

এক মুহূর্তে তন্দ্রা ছুটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। আর একটুও দেরি নয়। সোজা ওয়াই. এম. সি. এ-তে পৌঁছে তবে শান্তি। পালাব বলে পা বাড়িয়েও পালাতে পারলাম না। বিমান ঘোষ এবং উৎসবের অন্যান্য উদ্যোক্তারা একরকম আমাকে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়ে স্টেজের উপর বসিয়ে দিলেন।

অগত্যা রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত রবিশঙ্করের সঙ্গে সঙ্গতে লেগে থাকতে হল। দিল্লীর জলসায় এই আমার প্রথম অংশগ্রহণ। বিষ্ণুদিগম্বর জন্মতিথির পক্ষ থেকে বিনয়চন্দ্রজী আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে একটি চিঠি দেন। মস্কোয় থাকার সময় আমি তাঁর সেই চিঠি পাই।

যাবার আগের দিন রাত্রে ওয়াই. এম. সি. এ-র ছেলেরা এক জলসার আয়োজন করেছিল। এ কদিন তারা আমার সঙ্গে এত ভদ্র ব্যবহার করেছে যে, তাদের জলসায় থাকতেই হল। এই জলসায় মীরাও এসেছিল। কয়েকটি সুন্দর হালকা গান গেয়ে ওয়াই. এম. সি.-এর বাসিন্দাদের সে খুশি করল। খুব উৎসাহ করে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনালেন মেজর টুলু সেন। তবলা বাজাল মিঠনলাল।

তারপর গভীর রাত পর্যন্ত ওয়াই. এম. সি.-এর ছেলেরা মালপত্র বাঁধাছাঁদার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করল। তবলা নিয়ে যাবার জন্যে মালহোত্র আমাকে একটা ট্রাঙ্ক ধার দিল। বিমানবাবুর কথা লিখে বলবার নয়, চিরদিন মনে করে রাখবার। অফিসের কাজ সেরে সমস্ত অবসরটুকু আমাকে দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন।

যাত্রা শুরু

২৪শে অগাস্ট। সকাল নটায় প্লেন ছাড়বে। দিল্লী থেকে বোম্বাই। আমাদের দলে সবসুদ্ধ কুড়িজন। রাশিয়াতে পরে আরো দুজন যোগ দেন। বিমানঘাঁটিতে প্রত্যেকেরই আত্মীয়-বন্ধুরা এসেছেন বিদায় জানাতে। নানা প্রতিষ্ঠান থেকে এসে আমাদের গলায় মালা পরাচ্ছে। ফোটো তোলবার জন্যে মহা ধুমধাম। তাড়াতাড়ি, ছোটাছুটির অন্ত নেই। সবাই

কান খাড়া করে আছে কখন প্লেনে ওঠবার ডাক আসে। যাঁরা ছবি তুলতে ব্যস্ত এবং যাঁরা ছবি তোলাতে ব্যস্ত, তাঁদের অনেকেরই মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে আছে একটা ভাবনা। প্লেনে চড়বার ডাক আসবে, পরপারের নয় তো! আজকাল তো রোজ একটা করে বিমান দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যি বিদায়ের পালা এল। শত অপরিচিতের ভিড়ের মধ্যে বিদেশযাত্রী সকলেরই দৃষ্টি নিজেদের পরিচিত প্রিয় মুখগুলো খুঁজে বেড়াতে লাগল। আমাদের দলের লীডার মিসেস চন্দ্রশেখরণের ছোট্ট একটি বক্তৃতা। তারপরই আমরা একে-একে প্লেনে উঠতে আরম্ভ করলাম। বিমান ঘোষ এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে। ওঠবার সময় তাঁর সঙ্গে একটা করুণ হাসির বিনিময় হল। বেতার দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর কেশকর এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গেও দেখা হল। তিনিও স্মিতহাস্যে আমাদের শুভযাত্রায় অভিনন্দন জানালেন।

বোম্বাইয়ে একবেলা

দুপুর নাগাদ সাণ্টাক্রুজে এসে নামলাম। মালপত্র এয়ারপোর্টে রেখেই আমরা বোম্বাই শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। কেউ-কেউ দলছাড়া হয়ে যে যার আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দিনটুকু কাটাতে গেলেন। আমরা বেশির ভাগ গিয়ে উঠলাম তাজমহল হোটেলে।

লাঞ্চের পর আমরা গেলাম সরকারী ডকুমেণ্টারী ফিল্ম প্রোডাক্শনের ব্যবস্থা দেখতে। বাইরে তখন কখনো জোরে কখনো গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ডকুমেণ্টারী ফিল্মের কর্তারা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সব কিছুই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখালেন। দার্জিলিং সম্পর্কে একটি রঙিন ছবিও তাঁরা দেখালেন। সঙ্গে হাল্কা চায়ের ব্যবস্থা তো ছিলই।

সেখান থেকে সটান বোম্বাই বেতারকেন্দ্রে। খানিকক্ষণ চলল অভ্যর্থনা আর বিদায় অভিনন্দনের পালা। জনকয়েক খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হল। তার মধ্যে ছিলেন গজানন রাও যোশী এবং নরেন্দ্র শর্মা।

হাতে সময় খুবই কম। অথচ করবারও যে বিশেষ আছে তা নয়। দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ এয়ারপোর্টে গিয়ে হাজির হওয়া।

শকুর খাঁ আর আমি এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়লাম ওস্তাদ আমীর খাঁর

সঙ্গে দেখা করতে। ভারতবর্ষের যে কয়জন নামকরা সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আমার মেশবার সুযোগ হয়েছে, আমীর খাঁ তাঁদেরই একজন। আমীর খাঁ তো আমাদের দেখে অবাক! শকুর খাঁ ও আমার সান্ধ্যভোজের জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। বিরিয়ানি কাবাবের লোভ সম্বরণ করে আমাকে কিন্তু একাই বেরিয়ে পড়তে হল। আমাদের পরিবারের এক বিশিষ্ট বন্ধুর বাড়িতে একবার না গেলেই নয়।

হোটেলে ফিরে দেখি আমার প্রিয় ছাত্র বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ নিখিল ঘোষ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিখিলকে সঙ্গে করেই বেরিয়ে পড়লাম।

পারিবারিক বন্ধুর বাড়ি থেকে হোটেলে ফিরে নাকে-মুখে গুঁজে ডিনার শেষ করলাম।

এয়ারপোর্টে পেঁাছে কী যে করতে হল আর কী যে না করতে হল, লেখা দূরের কথা, এখনো ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। মনে হয়, উড়োজাহাজে করে আর যেন কোনোদিন বিদেশে যেতে না হয়।

প্লেন ছাড়বার একটা সময় অবশ্য থাকেই। কিন্তু মনে করুন, সেই সময়টা কোনো কারণে অনেকখানি পিছিয়ে গেল। আপনি কিন্তু কিছুই জানতে পারলেন না। কাস্টম্‌স, হেল্‌থ সার্টিফিকেট, লটবহর ওজন করা, মালপত্র সামলানো—সমস্তই আপনাকে পড়ি-মরি করে করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে আছে বিমান-কর্মচারীদের নির্বিকার ঔদাসীন্য, কোথাও বা সোজাসুজি উপেক্ষা। একে ভাদ্রের পচা গরম, তাতে বোম্বাই। তা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রচুর ছোটাছুটি করবার পর প্লেনে ওঠবার জন্যে যখন সবাই তৈরি, তখন জানানো হল প্লেন ছাড়বে সেই রাত বারোটায়।

কী রকম রাগ হয় ভাবুন তো! একবার বসি। একবার দাঁড়াই। সময় কিছুতেই কাটতে চায় না।...প্লেন ছাড়ল রাত বারোটার পরে।

মাটি ছেড়ে আকাশে

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের প্রকাণ্ড সুপার কন্‌স্টেলেশন প্লেন। চেয়ে দেখবার মতো বড়। ক্রু এবং যাত্রীর সংখ্যা একশোর কাছাকাছি।

জীবনে একবার না একবার উড়োজাহাজে চড়েছে এমন লোক আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল। কিন্তু আকাশপথে এত বড় একটা লম্বা

পাড়ি সকলেরই এই প্রথম। নিজের কথা বলতে গেলে, প্লেনে-চড়া আমি আদৌ পছন্দ করি না। এ ব্যাপারে স্বনামধন্য বড়ে গোলাম আলী খাঁর সঙ্গে আমার খুব মতে মেলে। তিনি বলেন : মানুষকে আকাশে ওড়ানো যদি খোদার মর্জি হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি তাদের ডানা গজিয়ে দিতেন; তা যখন তিনি দেননি, তখন নিশ্চয় মানুষ আকাশে উড়ুক এ তিনি চান না।

একবার এক বাদশাহ জীবনে প্রথম হাতির উপর সওয়ার হলেন। তার আগে অবশ্য তাঁর ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস ছিল। ধরাধরি করে তাঁকে তো কোনোরকমে হাতির পিঠে হাওদার উপর বসানো হল। হাওদার উপর বসেই তিনি হাঁক দিলেন : কই, লাগাম কোথায়? সঙ্গের লোক-জনরা তাড়াতাড়ি আদবদুরস্ত কায়দায় হুজুরকে জানিয়ে দিল : লাগামের দরকার নেই, হাতি চালাবে মাহুত। শুনে বাদশাহ তৎক্ষণাৎ হাতির উপর থেকে নেমে পড়লেন। নেমে পড়ে বললেন, 'সবার হুঁ মৈঁ, ঔর লগাম মেরে হাথ নহীঁ। লানৎ হৈ ঐসী সবারী পর।'

আমারও সেই কথা। এক মুহূর্তের জন্যে হোক বা কয়েক ঘণ্টা কিম্বা কয়েকদিনের জন্যেই হোক, আমার জীবনের দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়ে নিঃশেষে সে-দায়িত্ব আর কারো হাতে তুলে দিই কী করে? বিশেষ করে যখন জানি সে ব্যক্তিটির সমস্ত কেরদানি যে যন্ত্রটাকে নিয়ে, সময়-সময় বিগড়ে যাওয়াই তার স্বভাব।

জীবনে যতবারই প্লেনে চড়েছি, একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা প্রত্যেক-বারই আমাকে পেয়ে বসেছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে তবু মনটা অনেকখানি ভালো থাকে। কিন্তু মেঘ কিম্বা কুয়াশায় ঢাকা আকাশে যখন ঝাঁকুনি লাগে, আজ পর্যন্ত যতগুলো বিমান-দুর্ঘটনার খবর পড়েছি সমস্তই একে-একে মনে পড়ে যায়। তখন মনে হয়—দূর ছাই, না এলেই ভালো হত।

শেষ পর্যন্ত অকারণ উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচবার একটা সহজ এবং সরল উপায় বার করে ফেললাম। প্লেনে যখনই চড়ি, আগে থেকেই নিজের মনটাকে এই বলে শক্ত করে নিই—আমি বিমান-দুর্ঘটনায় আত্মহত্যা করতে চলেছি। লোকে যেমন গলায় দড়ি দেয়, আমিও তেমনি প্লেনে চড়ছি। ব্যস, এরপর আর মৃত্যুভয় কারো কাছে ঘেঁষতে পারে না।

সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে যাবার ইচ্ছাটা ছিল প্রচণ্ড, তার উপর আকাশযাত্রায় মৃত্যুভয় জয় করার অস্ত্রটাও আমার হাতের মুঠোয়। কাজেই প্লেনে উঠে নিজেকে মানিয়ে নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না।

যেতে যেতে

যে প্লেনে আমরা চলেছি, একেবারেই তা হালফ্যাশানের। পরিপাটি করে সাজানো। রবিশঙ্কর একজন অভিজ্ঞ বিমানযাত্রী। তাই আমি ইচ্ছে করেই তাঁর পাশের আসনটি বেছে নিয়েছিলাম।

আকাশে উঠে গিয়ে প্লেন যখন সুস্থির হয়ে চলতে শুরু করেছে আমরা একে-একে সিটের সঙ্গে বাঁধা বেল্টগুলো খুলে ফেললাম। তখনো পুরোদস্তুর প্রকৃতিস্থ হতে পারিনি। হঠাৎ বাঁদিকের কাঁচে-ঢাকা জানলার উপর নজর পড়ল। দেখলাম লেখা রয়েছে : 'এমার্জেন্সি এক্‌জীট।' এ-পাশে ও-পাশে তাকিয়ে দেখলাম আরো অনেকগুলো জানলায় একই ধরনের লেখা।

ঠিক সেই সময় সামনে থেকে একজন ইউনিফর্ম-পরা অফিসার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। একটা অদ্ভুত ধরনের জ্যাকেট তিনি আমাদের দেখালেন। তারপর নিজে পরে তাতে ফুঁ দিয়ে যখন তিনি ফোলালেন জ্যাকেটটা হয়ে গেল একটা বর্ম। তিনি বললেন, বিপদের সময় এই জ্যাকেট পরে এমার্জেন্সি এক্‌জিট দিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে।

তাঁর বলবার ধরনটা ছিল এমন যে, শুনে মনে হল বিপদবারণ জ্যাকেট পরে তিনি যেন এখুনি এই রাতের অন্ধকারে হাজার-হাজার ফুট উঁচু আকাশ থেকে যাত্রীদের লাফিয়ে পড়তে নির্দেশ দিচ্ছেন।

একটু পরেই বোঝা গেল আমাদের আশঙ্কাটা ছিল অমূলক।

আমরা চলেছি কায়রোর দিকে। সতেরো-আঠারো হাজার ফুট নিচে মাটি। প্লেনের আসনগুলো বসবার পক্ষে খুবই আরামের। পেছনে হেলান দেবার জায়গাটা কল টিপে সরানো গেলেও তাতে হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যায় না।

ক্রমে-ক্রমে রাতের অন্ধকার পাতলা হয়ে আসে। নিচের দৃশ্য দেখবার জন্যে যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। জানলার ঠিক পাশের আসনটা

দখল করবার জন্যে সবাই সুযোগ খোঁজে। আকাশে যে এতরকমের মেঘ আছে কে আগে জানতো! মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে চলেছি আমরা। নিচের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে লক্ষ-লক্ষ শাদা ভেড়ার পাল ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে মেঘ নেই, সেখানে উপর-নিচে শুধু নীল আর নীল। অন্তহীন নীল যেন স্তব্ধ সমুদ্রের মতো পড়ে আছে। সূর্যোদয়ের সময় মেঘের গায়ে স্বর্ণসিন্দুর। যেন হাট বসে গেছে রূপের।

নামা-ওঠার পথে

কায়রো এসে পড়ল বলে। নিচে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু-চারটে ঘরবাড়ি। ভারতীয় সময় সাড়ে-দশটায় আমরা কায়রোয় নামলাম। কায়রোর ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা। দুজন তরুণ বাঙালীর সঙ্গে দেখা হল। একজন বর্মণ, আরেকজন বসু। দুজনেই চলেছেন জার্মানীতে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে। একঘণ্টার উপর আমাদের কায়রোতে থাকতে হল। বেশ গরম। হাত-মুখ ধুয়ে আরেক দফা সকালের খাবার খেয়ে নেওয়া গেল। এখানকার বিমানঘাঁটিতে দেখবার মতো তেমন কিছু নেই।

তারপর পাঁচঘণ্টা একটানা ওড়বার পর দুপুর নাগাদ আমরা রোমে পৌঁছলাম। ভারতীয় সময় যখন প্রায় পাঁচটা রোমে তখন বারোটা। রোমের মাটিতে পা দিয়ে সত্যিই রোমাঞ্চ হল। একদিন এখান থেকেই সারা ইউরোপে সভ্যতার আলো জ্বলেছিল। এয়ারপোর্টে নেমেই বুঝলাম ইউরোপের দোরগোড়ায় এসে পড়েছি। কালবিলম্ব না করে আমরা খাবার টেবিলে বসে পড়লাম। ইতালীয় পরিচারকেরা দেখতে খুব সুপুরুষ। যেসব সুঘ্রাণ আর সুস্বাদু খাবার-দাবার এনে তারা উপস্থিত করল তা আমাদের পেটে যেতে একটুও দেরি হল না।

রোমে খুব বেশিক্ষণ আমরা থাকিনি। তারপর একলাফে জেনিভায়।

জেনিভায় যখন আমরা পৌঁছুলাম বিকেল গড়িয়ে গেছে। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে মালপত্র নামিয়ে ফেলতে হল। কেননা এখান থেকে প্লেন বদল করে জুরিখ হয়ে আমাদের ভিয়েনা পৌঁছুতে হবে। সেখান থেকে সোভিয়েট বিমান আমাদের সোজা তুলে নিয়ে যাবে।

জেনিভায় আমাদের হাতে ছিল প্রচুর সময়। সুইস প্লেনে মালপত্র বোঝাই করা হবে। তারপর সেই প্লেনে আমরা ভিয়েনা যাব।

জেনিভার এয়ারপোর্টে ভারি সুন্দর-সুন্দর সব সাজানো দোকান। সকলেরই ইচ্ছা ছিল কিছু-কিছু জিনিস কেনবার। যাবার সময় আর বোঝা বাড়ানো কেন, তার চেয়ে ফেরবার সময়েই সব কেনাকাটা করা যাবে। এই বলে আমরা নিজেদের সামলে রাখলাম। চায়ের পর্বটা ভূপৃষ্ঠেই সেরে নেওয়া গেল।

যখন আমরা প্লেনে চড়লাম সন্ধ্যে উৎরে গেছে। প্লেনে উঠতে না উঠতে নৈশভোজের তাড়া। ক্লান্তিতে সকলেরই শরীর-মন এলিয়ে পড়েছিল। কারো বিশেষ খাবার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু খাদ্যের গুণে সকলেরই খিদে বেড়ে গেল। কারো পাতেই বিশেষ কিছু পড়ে থাকল না। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আমরা জুরিখে এসে পৌঁছলাম। অন্ধকারে দূর-বিস্তৃত শহরের দীপমালা কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল!

জুরিখের বিমানঘাঁটি ঝলমল করছে অসংখ্য আলোয়। চোখ খুলে তাকাতে কষ্ট হয়। বড় প্যাভিলিয়নে ঢুকে তো আমরা অবাক। ওটা শুধু বিশ্রামের জায়গা কিম্বা বিমানঘাঁটির অপিস নয়, ওখানে আছে নানা মনোহারী জিনিসের সুসজ্জিত বড়-বড় দোকান। এত সুন্দর-সুন্দর জিনিস আর এত চমৎকার সাজানো দোকান আমাদের দেশের সেরা শহরগুলোতেও চোখে পড়ে না।

জুরিখে আমাদের অপেক্ষা করতে হল পাকা তিনঘণ্টা। প্লেন ছাড়তে বেশ রাত হল। ঘুম আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। বসে-বসেই একটু ঢুলে নেওয়া গেল।

মাঝরাতে অভ্যর্থনা

মাঝরাতে ভিয়েনায় এসে নামলাম। এখান থেকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আমাদের ভার নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাস্টম্‌স-এর ব্যূহ ভেদ করে আমাদের নিয়ে সাত-আটখানা মোটর দল বেঁধে ঘুমন্ত শহরের জনবিরল রাজপথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ফাঁকা খোলা জায়গা ক্রমে ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকাশোভিত শহরতলিতে পরিণত হয়। আমরা কেউই জানি না কোথায় চলেছি। আরো কিছুক্ষণ যাবার পর গাড়ি এসে থামল একটা প্রাসাদের সামনে। নেমে দেখি সোভিয়েট দূতাবাস।

দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এগিয়ে এসে আমাদের স্বাগত

জানালেন। দোতলার সুসজ্জিত হলঘরে আমাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ ঘণ্টা ধরে হাজার-হাজার মাইল আকাশপথে একটানা পাড়ি দেবার পর আমাদের কারো হাত-পা উঠছিল না। তবু দম-দেওয়া কলের মতো কর্তব্যগুলো করে যেতে হল। বিরাট টেবিলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নানারকম লোভনীয় খাবার সাজানো। তবু অবসাদে ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে যেন নেহাত কর্তব্যের খাতিরেই টেবিলে বসতে হল।

যথারীতি অভিনন্দন বিনিময়ের পর চলল পানভোজন। আমার পাশে এক রুশ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি ইংরেজী জানতেন। আমাকে জিগগেস করলেন, 'কখনো ভড্‌কা খেয়েছেন?' আমি বললাম, 'না।' শুনে তিনি অনুরোধ করলেন একবার খেয়ে দেখতে। বললেন রুশরা ভড্‌কার বেজায় ভক্ত।

ভড্‌কার কথা অনেক আগে থেকেই আমার শোনা। দেশ থেকে আসবার সময় অনেক বন্ধুই আমাকে সকৌতুক উপদেশ দিয়েছেন, 'ওহে, রাশিয়ার যাচ্ছ, ওদের ভড্‌কা জিনিসটা কি রকম একবার চেখে দেখে এস তো।' যাকে পানবিলাসী বলে, আমি তা নই। কিন্তু কৌতূহল বলেও তো একটা কথা আছে। তাই রুশ ভদ্রলোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য না করে জয় মা কালী বলে চুমুক লাগালাম ভড্‌কার পাত্রে। চুমুক দিতেই মনে হল আমার মুখের মধ্যে কে যেন তরল আগুন ঢেলে দিয়েছে। মহা ফাঁপরে পড়লাম। মুখে রাখা যায় না মনে হচ্ছে জিভ গলে যাবে। মুখ থেকে বাইরে ফেলাও যায় না। যদি গিলে ফেলি তাহলে নতুন কী বিপদ ঘটবে কে জানে। শেষকালে বুদ্ধি করে খানিকটা ফলের রস মুখের মধ্যে পুরে নিলাম। সে যাত্রায় রক্ষা পাওয়া গেল। তারপর সোভিয়েটের মাটিতে পা দিয়ে কোথাও আর ভড্‌কার পাত্রে হাত দিইনি।

ডিনারের পর গাড়িতে করে আমাদের পেঁছে দেওয়া হল কায়জারহফ হোটেলে, বাকি রাতটুকু যাতে আমরা কিছুটা বিশ্রাম করতে পারি। হোটেলের মধ্যে দু-একজন পোর্টার ছাড়া আর কাউকে আমাদের মাল বইবার জন্যে পাওয়া গেল না। রাত্রে ব্যবহারের জন্যে যতটুকু লটবহর দরকার তাই নিয়ে যে যার ঘরে আমরা উঠে গেলাম।

রাত তিনটেয় আবার বিশ্রাম কী? পুরুষরা লেগে গেলেন দাড়ি

কামাতে। কামরার সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম নেই। কাজেই প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই সাধারণ স্নানাগারের সামনে ভিড় লেগে গেল।

গোপীনাথ আর মস্তানা কোথা থেকে দুটো জলের টব যোগাড় করে এনে মাথায়-গায়ে মহানন্দে জল ঢালছে, এমন সময় হাজামৎ শেষ করে আমি আর রবিশঙ্কর বেরিয়ে এসে দেখি স্নানাগারের সমস্ত বারান্দাটাই জলে থৈথৈ করছে। গোপীনাথ আর মস্তানাকে তো তক্ষুনি জল ঢালা থেকে নিরস্ত করা হল। খোঁজ করে দেখা গেল—না স্নানের ঘরে, না বাইরে —কোথাও জল নিকাশের রাস্তা নেই। এখন উপায়? যে যার ঘরে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কেননা স্নানাগারের এলাকা ছাপিয়ে দুপাশের কোনো না কোনো কামরায় এ-জল ঢুকবেই।

কাল সকালে হোটেলওয়ালা জানতে তো পারবেই। কিন্তু তখনকার মতো হাতে-নাতে ধরা পড়বার লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

২৬.৮.৫৪। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যথাসময়ের আগেই হোটেলের স্টুয়ার্ডকে বলে তাড়াতাড়ি একটু কফি, রুটি আর মাখনের ব্যবস্থা করে নিলাম। তারপর গাড়িতে মালপত্র উঠিয়ে চটপট বিমানঘাঁটিতে রওয়ানা হওয়া গেল।

বড়-বড় চওড়া রাস্তা। সারবন্দী বিরাট-বিরাট বাড়ি। ঝকঝকে তক-তকে শহর। কোথাও যানবাহনের ভিড় নেই, মানুষের ঠেলাঠেলি নেই। দেখে একটু অবাক লাগল, রাস্তায় যারা চলাফেরা করছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বুড়ো-বুড়ি। কমবয়সী মেয়েপুরুষ খুব কম চোখে পড়ল।

সোভিয়েটের মাটিতে

সোভিয়েটের বিশেষ বিমানঘাঁটিতে পেঁছতে আমাদের সময় লাগল এক-ঘণ্টার মতো। আজও সে জায়গার বুক থেকে গত যুদ্ধের ধ্বংসচিহ্ন মুছে যায়নি। গিয়ে বোঝা গেল, এটা কোনো পাকাপোক্ত বিমানঘাঁটি নয়।

একটি প্লেনে এতজন লোকের জায়গা হবে না বলে আমাদের দলের চারজনকে আগের একটা প্লেনে রওয়ানা হয়ে যেতে হল। ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করবার পর আমরা বাকি কজন মালপত্র নিয়ে একটা ছোট বিমানে চড়ে বসলাম। বাইরের অবস্থা দেখে গোড়ায় আমাদের যাই মনে

হোক আকাশে ওঠবার পর বুঝলাম প্লেনের ভিতরটা দস্তুরমতো মজবুত, পাইলটের হাতও খুব পাকা।

প্লেনটা ছোট বলে বেশি উপর দিয়ে যেতে হল না। একে দিনের আলো, তার উপর আকাশে মেঘের তেমন উপদ্রব নেই। নিচেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে এদেশের প্রকৃতির মিল হয় না। যত দূর দেখা যায় শুধু অন্তহীন সবুজ। কোথাও অকর্ষিত পোড়োজমি চোখে পড়ল না। শস্যভরা উর্বর জমির কী বিরাট বিস্তার! উঁচু থেকে আন্দাজ করা কঠিন, তবে গাছপালা-রাস্তাঘাট-ঘরবাড়ির অনুপাতে বোঝা গেল—নানা আকারের চারকোণা চাষের জমিগুলোর প্রত্যেকটাই প্রকাণ্ড বড়-বড়।

দুপুর নাগাদ কিয়েভ-এ পেঁাছনো গেল। এই প্রথম আমরা সোভি-য়েটের মাটিতে পা দিলাম।

বিমানঘাঁটির সামনে প্রচুর লোক এসে জড়ো হয়েছে। প্লেন থেকে নামামাত্র কিয়েভবাসীরা ছুটে এসে আদর-অভ্যর্থনা করে আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। দুপক্ষ থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা হল। তারপরই ধুম পড়ে গেল ছবি তোলার। লাঞ্চ সেরে আবার প্লেনে গিয়ে বসতে হল। এখান থেকে মস্কো বেশ কয়েক ঘণ্টার পথ।

যখন আমরা মস্কোয় পেঁাছালাম, বেলা গেলেও তখনো সন্ধ্যা হয়নি। এয়ারপোর্টে গিজগিজ করছে লোক। সবাই আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে। কিয়েভ-এর চেয়ে চতুর্গুণ জাঁকজমকের সঙ্গে চলল মাল্যদান করমর্দন আর বক্তৃতার পালা। দলে-দলে ফোটোগ্রাফাররা এসেছেন, কেউ লোহার মই কেউ ঘড়াঞ্চি ঘাড়ে করে। মুভি-ক্যামেরার সংখ্যাও কম নয়। প্লেন এসে পেঁাছতে পাছে সন্ধ্যে হয়ে যায় তার জন্যে প্রকাণ্ড স্পটলাইট আর বিদ্যুৎ-সরবরাহকারী ট্রাক আনিয়ে রাখা হয়েছে।

অভ্যর্থনার পর্ব শেষ হলে পর আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়িগুলো প্রকাণ্ড বড়। মস্কোর বিরাট চওড়া রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। মস্কোর আবহাওয়া এ-সময় খুব ঠাণ্ডা নয়। হাওয়ার ভারি সুন্দর একটা স্নিগ্ধতা আছে।

আমাদের নিয়ে গিয়ে তোলা হল মস্কোর বিখ্যাত হোটেল সোভিয়েট স্কোয়ায়। প্রবেশদ্বার থেকে আরম্ভ করে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত

হল্‌, দালান বারান্দা, কামরা—সবই যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি সাজানো-গোছানো। স্থাপত্যের বাহাদুরী দেখে অবাক হতে হয়। যেদিকে তাকাও শ্বেতপাথর, কার্পেট, মখমল আর তেল-রঙা ছবি। অথচ তার মধ্যে কোথাও ঐশ্বর্যের চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বর নেই।

পেঁছবার সঙ্গে-সঙ্গে কে কোন ঘরে যাবে ঠিক হয়ে গেল। রবিশঙ্কর আর আমার ভাগে পড়েছিল একটি স্যুট—তাতে একটি বসবার, একটি পড়বার ও একটি শোবার ঘর, দুটি বাথরুম। আসবাবপত্র, গালিচা, দেয়ালে টাঙানো তেল-রঙা ছবি, ঝাড়বাতি, হাতের কাজ-করা দামী পর্দা—সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে একটা আভিজাত্য। বাইরে প্রচণ্ড শীত পড়লেও ক্ষতি নেই। সেণ্ট্রাল হীটিং-এর সাহায্যে গোটা হোটেলটি তাপনিয়ন্ত্রিত।

একে দীর্ঘ পথযাত্রায় শরীর অবসন্ন, তার উপর হোটেলের পুরু নরম বিছানা। শুতেই দুচোখ জড়িয়ে এল।

২৭.৮.৫৪। ভোরবেলায় পরিচারিকা এসে চা দিয়ে গেল। টেবিলের উপর আঙুর, পেয়ারা, আপেল, চকোলেট আর মিষ্টি-বোতলের-জল রাত্তির থেকেই সাজানো আছে। সেই সঙ্গে উপাদেয় সিগারেটের প্যাকেট। এ সবই রোজকার ব্যাপার। ড্রয়িংরুমে রেডিও সেট আর পিয়ানো। এখানে আমরা কী-কী অনুষ্ঠান দেখাব এবং তার জন্যে মহলা দেওয়া—এই সব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতেই সকালটা কেটে গেল।

বল্‌শই থিয়েটারে

লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম করে বল্‌শই থিয়েটারে স্টেজ দেখতে এবং কোথা থেকে কিভাবে আলো ফেলা হবে দেখাশোনা করতে যাওয়া হল। আমরা সবাই যে যার যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। যেমন বড় প্রেক্ষাগৃহ, তেমনি বড় তার মঞ্চ। বল্‌শই থিয়েটারের বয়স হল একশো-পঁচাত্তর বছর। এখানে-ওখানে কিছুটা মেরামত করতে হয়েছে বটে, কিন্তু তার পুরোনো রূপটা অবিকল ঠিক রেখে। বল্‌শই থিয়েটারের স্টেজটা আমাদের দেশের যে-কোনো বড় স্টেজের চেয়ে তিন-চারগুণ বড়। প্রেক্ষা-গৃহে বসবার সিট দু-হাজারেরও বেশি। সাততলার উপর হল্‌-এর চূড়ার

নিচে একটি বিরাট ঝাড়বাতি ঝোলানো। যখন জ্বলে, মনে হয় লক্ষ হীরা ঝলমল করছে। বিরাট জায়গা জুড়ে এই থিয়েটার। একদিকের সারবাঁধা সাজঘর থেকে অন্য দিকের সারবাঁধা সাজঘরের দিকে যেতে গেলে অনেকটা হাঁটতে হয়। সাজঘরের প্রত্যেক কামরায় প্রয়োজনমতো আসবাব-পত্র, সাজবার আয়না, হাত-মুখ ধোয়ার জলাধার, তাছাড়া স্টেজের উপর কোন অনুষ্ঠান চলছে তা জানবার জন্যে একটি করে লাউডস্পীকার। শোনা গেল ভিতরকার এই পুরোনো-পুরোনো ভাবটা ইচ্ছে করেই বজায় রাখা হয়েছে। থিয়েটারটির পুরোনো সংস্কৃতির স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। আজ পর্যন্ত যেসব বড়-বড় শিল্পী এই থিয়েটারের অপেরায় কিম্বা ব্যালেতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিকৃতি সাজঘরের দেয়ালে-দেয়ালে টাঙানো রয়েছে।

সোভিয়েট সার্কাস

বল্শই থেকে ফিরে এসে ডিনার খেয়েই আমরা সদলবলে রওয়ানা হলাম সার্কাস দেখতে। শরীর খারাপের দরুন শুধু তারা চৌধুরী যেতে পারলেন না।

আমরা পৌঁছবার আগেই সার্কাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখানে সার্কাস হয় তাঁবুতে নয়, পাকা বাড়িতে। ভিতরের চেহারা, যেমন সব সার্কাসের হয়—চারদিকে গোলাকার চেয়ারপাতা গ্যালারী। প্রকাণ্ড তার পরিধি এবং কোনো আসনই খালি নয়।

যেখান দিয়ে খেলওয়াড়রা ঢোকে তার উল্টোদিকে উঁচু পাটাতনের উপর অর্কেস্ট্রা বাজছে—যেমন সব সার্কাসেই বাজে। তবে এখানকার বাজনা তার চেয়ে ঢের উঁচুদরের।

দর্শকদের মধ্যে আছেন রুশ ছাড়াও সোভিয়েটের অন্য নানা জাতির মানুষ। যেমন : উজবেক, তাজিক, আজারবাইজান। মঙ্গোলীয় মুখের গড়ন। পুরুষদের অনেকেরই লম্বা দাড়ি আছে। মাথায় চ্যাপ্টা গোল টুপি। অনেককে দেখে ভুটিয়া বলে ভুল হয়।

সার্কাসে ছোট ছেলে তেমন চোখে পড়ল না। তার বদলে বুড়ো-বুড়িরই ভিড় বেশি। তাদের বয়স বেশি হলে কি হয়, রীতিমতো শক্ত-সমর্থ। চোখে-মুখে তাদের আনন্দের দীপ্তি।

জানোয়ারের খেলা একবারও দেখাল না। সমস্তই মানুষের খেলা। ট্রাপিজ, হরিজণ্টল বার, শারীরিক কসরত আর সেই সঙ্গে উচ্চাঙ্গের জাগ্‌লারি। এত ভালো খেলা আগে কখনো দেখিনি। চারজনে মিলে মুগুর, বল, চাকা নিয়ে এমন সুকৌশলে ছোঁড়াছুঁড়ি আর লোফালুফি করল যে দেখে তাক লেগে যায়। সব খেলার মধ্যেই ক্লাউনরা একবার করে ঢুকে পড়ে শুধু যে হাসায় তা নয়, সেই সঙ্গে এমন সব খেলা দেখায় যে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এখানে এসে পর্যন্ত একজনেরও রোগা লিকলিকে শরীর চোখে পড়েনি। সার্কাসে যাদের দেখলাম তাদের তো কথাই নেই।

২৮-৮-৫৪। সকালে আমাদের লীডারের ঘরে মিটিং। অনুষ্ঠানসূচী এবং নানা সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হল।

লেনিন-স্তালিন স্মৃতি তীর্থে

তারপর লাঞ্চ সেরে বল্‌শই থিয়েটারে ছোটা। সেখান থেকে দল বেঁধে গেলাম মুসোলিয়ম দেখতে।

রেড স্কোয়ারে ক্রেমলিনের একপ্রান্তে লেনিন-স্তালিনের স্মৃতিমন্দির। দলের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিনিধি পুষ্পপত্রশোভিত একটি শ্রদ্ধার্ঘ সেখানে অর্পণ করলেন।

রেড স্কোয়ারে পৌঁছবার প্রত্যেকটি রাস্তায় সার বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে। সেই বিপুল জনস্রোত নিঃশব্দে চলেছে কাঁচের শবাধারে শায়িত লেনিন-স্তালিনকে শ্রদ্ধা জানাতে।

আমরা এদেশের আমন্ত্রিত অতিথি বলে আমাদের আর সেই লম্বা সারির পেছনে দাঁড়াতে হল না। আমাদের সানন্দে পথ ছেড়ে দিয়ে জন-স্রোত রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা সোজাসুজি গিয়ে স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ করলাম।

সিঁড়ির ধাপ নিচে নেমে গেছে। চারদিক শান্ত গম্ভীর। সশস্ত্র শান্ত্রীর দল নিঃশব্দে পাহারা দিচ্ছে। পাশাপাশি দু-সারি হয়ে আমরা নিচে নেমে চললাম। দু-তিনটে বাঁক ঘোরবার পর সামনে নজরে পড়ল দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছোট একটি কামরার মতো কাঁচের শবাধার। তার মধ্যে ইজিচেয়ারের মতো

একটি বিছানায় শায়িত লেনিনের দেহ। তাঁর অবিকৃত মুখের উপর মৃদু-ভাবে পড়েছে বৈদ্যুতিক আলো। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম আর একটি কাঁচের শবাধারের মধ্যে একইভাবে রক্ষিত স্তালিনের দেহ।

দু-দন্ড দাঁড়িয়ে দেখবার উপায় নেই। যত মন্থরগতিতেই হোক সবাইকে এগিয়ে যেতে হয়। পিছনে নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ জনস্রোত। প্রত্যেককে দেখবার সুযোগ দিতে হবে। চারদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। আর তার বুক চিরে সমস্তক্ষণ স্মৃতিতীর্থ যাত্রীদের ধীর পদক্ষেপের একটানা খসখস শব্দ।

দুটি বিরাট মানুষের এই প্রত্যক্ষ উপস্থিতির আবহাওয়ায় মনে হল আমরাও যেন তাঁদের জীবনস্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে গেলাম। সে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি।

ভারতীয় দূতাবাসে

আবার ফিরে বল্‌শই থিয়েটারে। তারপর রিহার্সাল সেরে হোটেলে ফেরা। বিদেশী সাজসজ্জা ছেড়ে তাড়াতাড়ি স্বদেশী দরবারী পোশাক পরে নিতে হল। ভারতীয় দূতাবাস থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে।

বেশ চমৎকার জায়গায় আমাদের ভারতীয় দূতাবাসটি। ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কে. পি. এস. মেনন সস্ত্রীক এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। দূতাবাসের সকলের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হল। দেখা গেল একাধিক বাঙালী আছেন সেখানে। দাশগুপ্ত এবং ভাদুড়ী সপরিবারে; বোস আছেন একা। আমাদের প্রীতিসম্মেলনে আরো অনেক অতিথি-অভ্যাগত এসেছেন। মেনন বেশ রসিয়ে বক্তৃতা দিতে পারেন। অতিথি-সৎকারেও খুব উদার। তাই বেশ মুক্তহস্তেই পান-ভোজনের ব্যবস্থাটা হয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একটা জলসার ব্যবস্থা ছিল। সুরেন্দর কাউরের লোকসঙ্গীত, গোপীনাথের নাচ আর রবি-শঙ্করের সেতার। কিষেণ মহারাজ কাবুল থেকে তখনো মস্কোতে এসে পৌঁছননি। রবিশঙ্করের সঙ্গে আমাকেই তবলা সঙ্গত করতে হল।

রবিশঙ্করের বাজনা ছিল সবশেষে। বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় আইসক্রিম এসে চড়াও করল। ব্যাপারটা সত্যিই খুব বিরক্তিকর ঠেকে-

ছিল। আমাদের দেশে বড়-বড় লোকদের বাড়ির জলসায় এ-জিনিস প্রায়ই ঘটে। কিন্তু বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে শিল্পীর প্রতি না হোক অন্তত ভারতীয় শিল্পসাধনার প্রতি আর একটু শ্রদ্ধা দেখতে পাব আশা করেছিলাম। ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা আলাদা। তাকে দিয়ে ভোজসভার নিমন্ত্রিতদের মনোরঞ্জন করানো চলে না।

বলশইতে মহলা

২৯-৮-৫৪। লাঞ্চের পরই বলশই থিয়েটারে আজ রিহার্সাল শুরু হল। অর্ধেক হয়ে যাবার পর আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হল। ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা এসে গোড়া থেকে দেখতে চাইলেন। এভাবে সময় নষ্ট করবার কোনো দরকার ছিল না। তবু করতে হল। নৃত্যগীতের বেশির ভাগই আমাদের কাছে নিজেদের দেশের মাপকাঠিতে মামুলি লাগছিল। তবে ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে এখানকার লোকদের যেরকম শ্রদ্ধা আর আগ্রহ, তাতে উতরে যাবে বলেই মনে হয়।

এ কদিনের মধ্যেই আমরা অবাক হয়ে গিয়েছি সোভিয়েটের লোকদের আন্তরিকতা আর কর্মতৎপরতা দেখে। কী ব্যক্তিগত প্রয়োজন আর কী দলগত প্রয়োজন—সমস্তই যেন আপনাআপনি মিটে যাচ্ছে। রিহার্সাল দিতে গিয়ে আমরা বুঝলাম পারস্পরিক সহযোগিতা, সময় ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলা, নির্ভুলভাবে সব কাজ আগে পরে করে যাওয়া—এসব ব্যাপারে আমরা কত আনাড়ী। সোভিয়েটের সাংস্কৃতিক দপ্তর এবং বলশই থিয়েটারের কর্মীরা পদে-পদে আমাদের সাহায্য না করলে আমাদের পক্ষে কোনো অনুষ্ঠান করাই সম্ভব হত না।

সন্ধ্যার পর আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

আশ্চর্য প্রদীপ

৩০.৮.৫৪। আজ বলশই থিয়েটারে আমাদের সঙ্গীতানুষ্ঠানের উদ্বোধন। রাত আটটায় আরম্ভ। দুঘণ্টা আগেই আমরা গ্রীনরুমে হাজির।

থিয়েটারের কর্মকর্তা সাজঘরের প্রত্যেক কামরায় ঢুকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন। আমাদের অনুষ্ঠান যাতে সার্থক হয় তার

জন্যে এখানকার সংগঠনকারীদের মাথাব্যথা কোনো অংশে কম বলে মনে হল না। যাতে কারো কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্যে বিশেষ-বিশেষ কর্মী মোতায়েন করা হল। তাঁরা দেখবেন যথাসময়ে যথাযথ সজ্জায় প্রত্যেক শিল্পী যাতে মঞ্চে হাজির হতে পারেন। কিছু একটা চাইলেই সঙ্গে-সঙ্গে তা হাতে এসে যাচ্ছে।

স্টেজের দুপাশে মৈত্রীর প্রতীক হিসেবে টাঙানো হয়েছে ভারত আর সোভিয়েটের জাতীয় পতাকা। মঞ্চের দুপাশে সামনের দিকে রাখা হয়েছে পিতলের দুটি বিরাট দীপাধার। এই দীপাধার দুটি আমাদের দলের নেত্রী ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন।

আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে এমন সময় মজার এক ঘটনা ঘটল।

দীপাধার দুটি যখন রাখা হয় থিয়েটার কর্তৃপক্ষ প্রথমে বুঝতেই পারেননি কেন রাখা হচ্ছে। সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে যাবার পর তেল আনানো হল, কোনোরকমে সলতেও তৈরি করা হল। তারপর যখন আগুন দিয়ে আমরা সেগুলো জ্বালাতে যাচ্ছি, থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দুঃখের সঙ্গে এসে জানালেন স্টেজের ভিতরে প্রদীপ জ্বালানো নিরাপত্তার দিক থেকে নিয়ম-বিরুদ্ধ। আমাদের নেত্রী বেচারী বেজায় দমে গেলেন। নিরুপায় হয়ে তখুনি আগুন নিভিয়ে ফেলতে হল।

পর্দা উঠবার সময় হয়ে গেছে। যে যার সাজঘরে গিয়ে আমরা তৈরি হয়ে এলাম। স্টেজের উপর এসে দাঁড়িয়েছি কি দাঁড়াইনি হঠাৎ সামনে চোখ পড়ল। দীপাধার দুটি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, দুটো দীপাধারেই সারি-সারি সলতের মুখে আগুন জ্বলছে।

আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, শেষ পর্যন্ত যাহোক আগুন জ্বালাবার অনুমতি মিলেছে।

পরে বুঝলাম ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সাজঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে আসতে আমাদের যেটুকু সময় লেগেছে তারই মধ্যে বিদ্যুৎবিভাগের কর্মীরা দীপাধারে নকল অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ছোট-ছোট ইলেকট্রিক বাল্‌ব আর তুলোর সলতে দিয়ে তাঁরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁদের আন্তরিকতা দেখে আমরা অভিভূত না হয়ে পারিনি।

পর্দা উঠবার আগে থিয়েটারের অর্কেস্ট্রায় বেজে উঠল 'জনগণমন-অধিনায়ক'; তারপর সোভিয়েটের জাতীয় সঙ্গীত।

তিলধারণের স্থান নেই। প্রেক্ষাগৃহে দু-হাজারেরও বেশি লোক। তাছাড়া টেলিভিশনে দেখতে-শুনতে পাবে আরো তিন লক্ষ লোক। একটি করে অনুষ্ঠান শেষ হয় আর হর্ষধ্বনিতে হলঘর ফেটে পড়ে। পর্দা পড়ে যাবার পরও অবিরাম করতালির মধ্যে সবাইকে একাধিকবার স্টেজের সামনে বেরিয়ে এসে দর্শকের অভিনন্দন নিতে হল। নৃত্য-শিল্পীরাই দর্শকদের বেশি আকৃষ্ট করলেন। তার মধ্যে বিশেষ করে তারা চৌধুরী।

আজকের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান ছিল ইকবালের রচিত এবং রবি-শঙ্করের সুর সংযোজিত সমবেত কণ্ঠের গান 'সারে জহাঁসে অচ্ছা'। পর্দা উঠতেই স্টেজের উপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল সিনেমা আর টেলিভিশানের প্রয়োজনে আনা চোখ-ধাঁধানো আলো। আমাকে আর গান গাইতে হল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু ঠোঁট নাড়াতে লাগলাম। একে আমার চোখ খারাপ, তার উপর আলোর ঝাঁঝে মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাব। কিন্তু এর পর যখন পট্টবর্ধনজী, শকুর খাঁ আর পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে বসে তবলা সঙ্গত করলাম তখন আর বিশেষ অসুবিধা হল না।

অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল নৃত্য-গীত-বাদ্য। কিছু একক, কিছু যমল, আর কিছু সম্মিলিত। কয়েকজন শিল্পীও উঁচুদরের ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় মাপকাঠিতে চুলচেরা বিচার করলে কোনো অনুষ্ঠানই খুব উচ্চাঙ্গের বা সুসম্পন্ন হতে পারেনি। বিদেশী শ্রোতারা পাছে অধৈর্য হয়ে পড়েন সেই ভয়ে ভালো-ভালো শিল্পীদেরও এত অল্প সময়ের মধ্যে একক অনুষ্ঠান সারতে হল যাতে তাঁরা মোটেই অভ্যস্ত নন। কাজেই তাঁদের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অসম্পূর্ণতার ভাব না থেকে পারেনি। অবশ্য এটাও ঠিক, এসব ক্ষেত্রে আপস না করে চলে না। তাছাড়া দলের মধ্যে সবই যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন তা নয়। নির্বাচনের দিক থেকে সেখানে ত্রুটি ছিল।

তাতে অবশ্য আটকায়নি। বিদেশী শ্রোতারা ছিলেন সহৃদয়। জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে নৃত্যের স্থান সবার উপরে; তারপর যন্ত্রসঙ্গীত;

আর সবার নিচে কণ্ঠসঙ্গীত। আবার ক্লাসিক ও সাম্প্রতিক সঙ্গীতের মধ্যে দেখা গেল দ্বিতীয়টাই ওদেশের লোকের কাছে বোধগম্য। রবিশঙ্কর, নারায়ণস্বামী, শকুর খাঁ না এসে তাঁদের বদলে যে কোনো সাধারণ যন্ত্র-শিল্পী এলেও বিদেশী শ্রোতাদের কাছে খুব বেশি ইতরবিশেষ হত বলে মনে হয় না।

সমবেত কণ্ঠে 'জনগণমন-অধিনায়ক' দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল। তারপর চলল মাল্যদান ও বক্তৃতা। আমাদের পক্ষ থেকে বললেন শ্রীমতী চন্দ্রশেখরণ। নানা দিক থেকে নানা রকম ক্যামেরায় অসংখ্য ছবি উঠল। হল্‌ঘর জুড়ে শুধু আলোর বন্যা। যেদিকে চোখ পড়ে রাজকীয় কারু-কার্য। চারদিকে সুসজ্জিত নরনারীর বিপুল অভিনন্দন আর মুহুর্মুহুঃ হর্ষধ্বনি। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আনন্দে আর গর্বে আমাদের মন ভরে উঠল। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হয়ে একটি সাংস্কৃতিক দল নিয়ে আমরা এসেছি সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ নগরী মস্কোতে। ভারতীয় নৃত্যগীতের উন্নত কলাকৌশলের সঙ্গে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পানুরাগী জাতির এই প্রথম পরিচয়।

বল্‌শই থিয়েটারে সেদিন সন্ধ্যায় ভারতবর্ষ আর সোভিয়েট ইউ-নিয়নের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের এক ঐতিহাসিক রাখিবন্ধন হল।

মার্শাল বুলগানিন

জলসা শেষ হবার পর থিয়েটার সংলগ্ন জমকালো ডাইনিং হল্‌-এ ডিনার। সোভিয়েটের দেশরক্ষামন্ত্রী তখন মার্শাল বুলগানিন। তিনি এসে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত মেনন সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েটের আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সেখানে দেখলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাগানোভিচ এবং গ্রমিকো।

আমাদের দলে যেসব মহিলা ছিলেন মার্শাল বুলগানিন তাঁদের উৎকৃষ্ট চকোলেট দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। দোভাষীর সাহায্যে দলের সকলের সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে আলাপ করলেন। তাঁর আন্তরিকতা দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। দেখা গেল, মেলবার মন থাকলে মানুষে-মানুষে মিলতে ভাষায় বড় একটা আটকায় না।

টোস্টের পর টোস্ট চলল। আমার মতো পশ্চাৎপদ ব্যক্তিও উৎসাহের

মাথায় সোভিয়েটদেশের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদ্যোগী কর্মীদের উদ্দেশ্যে টোস্ট প্রস্তাব করে বসল।

উৎসবের শেষে মার্শাল বুলগানিন বলতে উঠলেন। শুনে মনেই হল না উনি বক্তৃতা দিচ্ছেন। যেন এক স্থিরপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ তাঁর জীবনের উপলব্ধি-গুলো অবলীলাক্রমে সকলের সামনে মেলে ধরছেন।

প্রথমে ভারতের কলাকারদের এবং সঙ্গে-সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুকে তিনি সাধুবাদ দিলেন। আস্তে-আস্তে সংস্কৃতি ছাড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এসে পড়ল। তিনি খুব আশার সঙ্গে ভারত, চীন আর সোভিয়েটের মৈত্রীর কথা উল্লেখ করলেন। বললেন : আমরা বাস্তবিকই শান্তি চাই। চাই দুনিয়া জোড়া শান্তি। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সে কথা জানুক।

ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাঁরা অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছেন; তাঁরা বিশ্বাস করেন ভারতও তাঁদেরই মতো শান্তির নীতিতে আস্থাবান—মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বললেন।

এই বলে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন : আমরা শান্তি চাই, আমরা লড়াই চাই না এইজন্যেই যে তিন-তিনটি যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আর মানবজাতির কি ক্ষতি হয় আমরা জানি। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে যুদ্ধবিরোধী তার কারণ এ নয় যে আমরা দুর্বল। নিজেদের শক্তিসামর্থ্যে আমরা বিশ্বাসী। যারাই লড়াই চায় না আমরা তাদেরই বন্ধু।

ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব কামনা করবার সময় তাঁর কণ্ঠ আবেগে কম্পমান হয়ে উঠেছিল।

সারাক্ষণ আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম।

৩১.৮.৫৪। সকালে চায়ের টেবিলে 'প্রাভ্‌দা' এবং আরো কয়েকটি কাগজ দেখলাম। আমাদের গতরাত্রের অনুষ্ঠানের ফোটোগ্রাফ এবং সমালোচনা বেরিয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কেই সপ্রশংস মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রাতরাশের পর আমরা বাসে করে শহর দেখতে বেরোলাম। বিশিষ্ট রাস্তাঘাট, প্রাসাদ, নদী, পুল—এইরকমের কিছু-কিছু দ্রষ্টব্য স্থান এখন-কার মতো এক নজরে দেখে নেওয়া গেল। তবু দু-ঘণ্টার কমে হল না।

আমাদের সঙ্গে দোভাষিণী ছিলেন অল্‌গা ও হেনরিয়েটা। আর ছিলেন একজন মহিলা গাইড। আমাদের দলে ছিলেন চব্বিশজন। দিল্লী ছেড়েছি প্রায় সপ্তাহখানেক হতে চলল। নিজেদের মধ্যে পরিচয় একটু-একটু করে ঘনিষ্ঠতর হতে চলল।

আমাদের দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের পরিচয় সংক্ষেপে দিয়ে রাখি।

প্রতিনিধিদের পরিচয়

১ পণ্ডিত বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন। আমাদের মধ্যে ইনি সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। পুণার বিখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী।

২ শকুর খাঁ। কেরানার খানদানের বিখ্যাত সারেঙ্গীবাদক (দিল্লী রেডিও)।

৩ শ্রীমতী চন্দ্রশেখরণ। আমাদের দলের সরকার কর্তৃক নির্বাচিত নেত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের উপমন্ত্রী।

৪ কে. এস. মালিক। ইনি দিল্লী রেডিও-র স্টেশন ডিরেক্টর। আমাদের দলের অনুষ্ঠান-সূচীর পরিচালক।

৫ ডক্টর বিক্রমসিংহ। ইনি আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকশাস্ত্রের ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। আমাদের দলের সেক্রেটারী।

৬ পণ্ডিত রবিশঙ্কর। বিখ্যাত সেতারবাদক ও সুরস্রষ্টা।

৭ নারায়ণস্বামী। ত্রিবান্দ্রমের বিখ্যাত বীণাবাদক।

৮ মীরা চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা।

৯ তারা চৌধুরী। কথক ও ভারতনাট্যম শিল্পী।

১০, ১১, ১২ তারা চৌধুরীর নাচের সহযোগী শিল্পী : গায়ক সূর্যনারায়ণ, মৃদঙ্গবাদক কৃষ্ণ পিল্লে, বংশীবাদক ডোরাইস্বামী।

১৩ কিষণ মহারাজ। বেনারসের বিখ্যাত তবলাবাদক।

১৪ সুরেন্দর কাউর। দিল্লীর জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পী।

১৫ আশাসিংহ মস্তানা। দিল্লীর লোকসঙ্গীত শিল্পী।

১৬ বিজয় রাঘব রাও। দিল্লীর রেডিও-শিল্পী। একাধারে ভারতনাট্যম এবং বাঁশরী বিশারদ।

১৭ গোপীনাথ। বিখ্যাত মলয়ালী নৃত্যশিল্পী।

১৮ তম্বিনো দেবী। মণিপুরী নৃত্যশিল্পী।

১৯ সূর্যমুখী। মণিপুরী নৃত্যশিল্পী।
২০ নদীয়া সিংহ। মণিপুরী মৃদঙ্গবাদক।
২১ বাবু সিংহ। মণিপুরী মৃদঙ্গবাদক।
২২ ইবটম শর্মা। মণিপুরী নৃত্যশিল্পী।
২৩ চিত্রসেন সিংহ। মণিপুরী নৃত্যশিল্পী।
২৪ লেখক।

মস্কো শহর

ইউরোপ তো বটেই, গোটা পৃথিবীর মধ্যে মস্কো একটি সেরা শহর। পথঘাট, ঘরবাড়ি সবই বড়-বড়। প্রায় সব বাড়িই প্রাসাদের মতো। পুরোনো বাড়ি চোখে পড়ে না বললেই হয়। রুশ বিপ্লবের আগে এ অবস্থা ছিল না। তখন শতকরা নব্বইটা বাড়ি ছিল একতলা-দোতলা।

দেখলেই বোঝা যায়, শহরটা ফাঁদাই হয়েছে প্রকাণ্ড বড় করে। সরু অলিগলির কোনো অস্তিত্বই নেই। স্থাপত্যের মধ্যে, বাড়ি তৈরির ধাঁচ-গুলোর মধ্যে যেমন একঘেয়ে ছক-কাটা ভাব নেই, তেমনি আবার খাম-খেয়ালিপনাও নেই। বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে।

এক-এক জায়গায় রাস্তার বিস্তার প'চাত্তর মিটার পর্যন্ত। পথেঘাটে যানবাহন আর লোক চলাচল করছে। কিন্তু কোথাও গতিরুদ্ধ ভিড় নেই। রাস্তায় যেতে-যেতে কোথাও অবাঞ্ছিত—কৌতূহলোদ্দীপক একটি দৃশ্যও চোখে পড়ল না।

শহরের মধ্যে একটি বাড়িও কারো নিজের নয়। নিজের বাড়ি বা ভূসম্পত্তি গ্রামেই শুধু সম্ভব।। শহরের সব বাড়িই কোনো না কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া অবশ্য অনেক বাড়ি আছে, যাকে বলা হয় এ্যাপার্টমেণ্ট হাউস। বিভিন্ন ইউনিয়নের কর্মীরা অল্প খরচায় উন্নত ধরনের এইসব বাড়িতে থাকতে পারেন। এই ধরনের একটি প্রকাণ্ড এ্যাপার্টমেণ্ট হাউস দেখলাম। মস্কোর নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের মতোই এর স্থাপত্য। এখানে তিন, চার বা পাঁচটি কামরাযুক্ত সাড়ে-চারশো ফ্ল্যাট আছে।

মস্কোর সব রাস্তা কিন্তু বরাবরই এত প্রশস্ত ছিল না। দেশ পুনর্গঠনের কাজ যখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেল, তখন অনেক বাড়ি

আর প্রাসাদ ভেঙে রাস্তা চওড়া করা হল। রাস্তা বাড়াবার জন্যে মস্কোতে এক অদ্ভুত ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। নিজের চোখে না দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

বাড়ি সরানোর বাহাদুরি

স্থাপত্যবিভাগের কর্তারা প্রথম-প্রথম রাস্তা বড় করতে গিয়ে খুবই মুশকিলে পড়লেন। যে বাড়ির অনেক দিনের পুরোনো ঐতিহ্য, সে বাড়ি তাঁরা ভেঙে ফেলেন কী করে?

তখন তাঁরা এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। বাড়িটাকে না ভেঙে তাঁরা অবিকৃত অবস্থায় অনেকখানি দূরে সরিয়ে দিলেন। তখন আর রাস্তা বাড়াতে কোনোই হাঙ্গামা নেই।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে :

যে বাড়িটা সরাতে হবে, তার চারপাশে মাটি কেটে ভিত ছাড়িয়েও অনেক নিচে পর্যন্ত খালি করে নেওয়া হয়। বাড়িটির অনেক নিচে এবং ঠিক তলায় রেল পেতে তার উপর প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মজবুত কাঠের রলা চালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর যেদিকে সরানো হবে সেইদিকের সমস্ত মাটি কেটে খালি করে যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত রেল বসিয়ে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তির চাপে বাড়িটি ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজটা করতে হয় খুব আস্তে-আস্তে। আট থেকে বারো মিটার সরাতে একঘণ্টার মতো সময় লাগে।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, বাড়ি যখন সরানো হয় তখন তার বিদ্যুত বা জল সরবরাহের কোনো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। এইভাবে মস্কোর অনেক প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্র অটুট রেখে পথঘাট চওড়া করা হয়েছে। এতে যা টাকা খরচ হয়, তাতে হয়তো আস্ত একটা নতুন বাড়ি তৈরি করে ফেলা যায়। কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যের মূল্য এঁদের কাছে মোটেই কম নয়। তাই খরচ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

একজনের কাছে একটা মজার ব্যাপার শুনলাম। একবার একটা ইস্কুলবাড়ি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো হয়েছিল। তাতে কিন্তু ক্লাস বন্ধ হয়নি। যেসব বাপ-মা সকালবেলায় ছেলে-মেয়েদের পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন, বিকেলবেলায় তাদের নিতে এসে তাঁরা অবাক

হয়ে গেলেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়েই স্কুলবাড়িটা সেখান থেকে কোথায় সরে পড়েছে!

শহরে ঘুরতে-ঘুরতে দেখলাম ক্রাইমিয়া ব্রিজ। মুক্ত আকাশের তলায় একটি নাট্যশালা দেখলাম—নাম গ্রীন থিয়েটার। তাতে দু-লক্ষ লোকের বসবার জায়গা। অনেক হাসপাতাল দেখলাম যার বাড়ি অষ্টাদশ শতকের কিন্তু চিকিৎসা চলছে আধুনিকতম পদ্ধতিতে। এখানে চিকিৎসার জন্যে কাউকে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হয় না।

শুনলাম মস্কোতে ১৯৩৯ সালের পর আর লোক-গণনা হয়নি। তখনই লোকসংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ।

মস্কোর নতুন যে বিদ্যালয় ভবন উঠেছে তা দেখবার মতো। এ যাত্রায় আমরা বাইরে থেকে এর আকাশচুম্বী চেহারাটাই শুধু দেখলাম। ঠিক হল, মাসখানেক পরে তো আমরা ফিরছি, তখন ভালো করে দেখা যাবে।

সংস্কৃতি-দপ্তরে সম্বর্ধনা

শহর ঘুরে দেখার পর সোভিয়েট সরকারের সংস্কৃতি-দপ্তরে দ্বিপ্রাহরিক ভোজসভা। অভ্যর্থনার ব্যবস্থাটা রাজকীয় বললেও খুব বেশি বলা হয় না।

টেবিলে অঢেল খাবার আর পানীয়। এদেশের দস্তুরই এই। নিজেদের আলাদা দল করে বসা চলবে না। সোভিয়েটবাসী আর ভারতবাসী এক-সঙ্গে মেশামেশি করে বসতে হবে। আমাদের দেশের একজন পুরুষের পাশে ওঁদের দেশের একজন মহিলা; তাঁদের দেশের পুরুষের পাশে আমাদের দেশের একজন মহিলা।

এই ধরনের ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন সোভিয়েট দেশের বিভিন্ন দিকের দিকপাল। তাঁদের মধ্যে কেউ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তি, কেউ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী, কেউ সুলেখক, কেউ খ্যাতিমান চিত্রকর; আর থাকতেন নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, সঙ্গীত-কলাকার, অপেরা ও ব্যালের নৃত্য-শিল্পী।

ভাষা না জানার দরুন বড্ড ঠেকে যেতে হত। টেবিলের মাঝখানে-মাঝখানে দোভাষী থাকলেও বিরাট হল্ জুড়ে শতাধিক লোক যদি অবাধে মেলামেশা করতে চায় তাহলে মাথাপিছু একজন দোভাষী দিলেও

কুলোয় না। কাজেই দোভাষী ছাড়াই আমরা কিছুটা হাত-মুখের ইশারায়, কিছুটা ইংরেজিতে, কখনো-কখনো বা কিছুটা সদ্য-শেখা রুশ বুলি আওড়ে পাশের লোকের সঙ্গে ভাব করে ফেলতাম।

আমাদের দলের সঙ্গে যেসব দোভাষী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ ভালোভাবে ইংরেজি সড়গড় ছিল আলেকজান্দ্রিয়া আর অল্গার। হেনরিয়েটার তখনো ইংরেজি শেখার মেয়াদ শেষ হয়নি, কিন্তু তার উৎসাহের অন্ত নেই। দোভাষী হওয়া ছাড়াও, অল্প বয়স বলে সে আমাদের সমস্ত রকম ফাইফরমাশ খেটে দেয়। গালা একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ইংরেজি বললেও ভাঙা হিন্দির জোরে সে কাজ চালিয়ে নেয়। লেনিনগ্রাডে যাবার আগে পর্যন্ত আরেকজন মহিলা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর নাম তানিয়া। শুধু যে তিনি ভালো ইংরেজি বলতেন তাই নয়, আমাদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়ে খাটতেন। পুরুষদের মধ্যে ভালো ইংরেজি বলত একমাত্র ইউরেক্।

লাঞ্চের পর ঘর বদলে অন্য একটা হল্-এ ফল আর কফির টেবিলে ছোট-ছোট দল বেঁধে আমরা বসে গেলাম। আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন সংস্কৃতি-দপ্তরের জেগারফ এবং একজন খ্যাতনাম্নী অপেরা গায়িকা। তাঁরা বিনায়ক পট্টবর্ধনজীকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা খোলা গলায় গান না গেয়ে, আওয়াজ চেপে গান করেন কেন?'

পট্টবর্ধনজী যদি খোলা গলায় গান না করেন তো আমাদের দেশে আর করে কে? আমার মনে হল, পণ্ডিতজী খোলা গলায় গান করলেও কণ্ঠস্বরে একটা চাপা ভাব থাকায় মস্কোর শিল্পীরা হয়তো তাকে চাপা গলার গান বলে ভুল করেছেন। কথাটার তাৎপর্য বুঝলাম পরে—যখন আমরা বিভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষায়তনে আর অপেরায় তাঁদের 'মুক্তকণ্ঠের' গান শুনলাম। গলায় স্বর খেলাতে গিয়ে এঁরা আওয়াজের ওজন কম-বেশি করেন, কিন্তু তাই বলে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনিকে রুদ্ধ করবার রেওয়াজ এদেশে নেই।

ভূগর্ভে রেলপথ

তিনঘণ্টা কেটে গেল লাঞ্চের টেবিলে। তারপর আমরা বেরোলাম মাটির নিচে রেলপথ 'মেট্রো' দেখতে।

স্টেশনে পেঁছিবার জন্যে চক্রাকারে ধাবমান সিঁড়িতে তাক করে লাফিয়ে পড়তে হল। নামছি তো নামছিই। অনেকক্ষণ পর তল পাওয়া গেল।

পাঁচ-ছবার ট্রেন বদল করে মাটির নিচের পাঁচ-ছটা স্টেশন দেখলাম। মস্কো শহরে লোকের ভিড় দেখলাম ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভেই বেশি। কিন্তু সে ভিড় ট্রেন আসতে আর যেতে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। ট্রেনগুলো দেখতে চমৎকার—ভিতর যেমন, বাইরেটাও তেমনি। না থাকার মধ্যে যেটা সব থেকে চোখে পড়ে তা হল বাথরুম।

স্টেশনে ট্রেন থামে খুব অল্প সময়ের জন্যে। ফলে, একবার 'লখ্নবী তকল্লুফ' করতে গিয়ে একটু হলেই মরেছিলাম আর কি! 'পহলে আপ্,' 'পহলে আপ্' করে আশেপাশের সবাইকে তো উঠিয়ে দিলাম। আমি উঠতে যাব এমন সময় আমার কোটের আস্তিনটা চেপে ধরে আমাকে বাইরে রেখে ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে। ভিতরে বাইরে বেশ একটা শোরগোল পড়ে গেল। এক্ষুনি কী একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটবে! এমন সময় আমার কপালগুণে দরজাটা খুলে গেল। তক্ষুনি চলন্ত ট্রেনে আমি লাফিয়ে উঠলাম। আসলে যাত্রীদের মধ্যে একজনের দরজা খোলবার কায়দাটা জানা ছিল। আমার অবস্থা দেখে তীরবেগে ছুটে গিয়ে দরজাটা তিনি খুলে দিয়েছিলেন বলেই এ-যাত্রায় আমি বেঁচে গেলাম।

মস্কোর মাটির নিচেকার এই স্টেশনগুলো এমন অনবদ্য সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে এর তুলনা নেই। প্রত্যেকটি স্টেশন কোনো-না-কোনো রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত। সেই রিপাবলিকের কৃষ্টি আর ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে আর বিচিত্রবর্ণ পাথরের কাজে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া চারদিক এমন আলোয় আলো হয়ে আছে যে পাতালপ্রবেশ বলে মনেই হয় না। উপর-নিচে আশেপাশে যেদিকে তাকাই, হয় শ্বেতপাথর নয় নানা রঙের পাথরের কাজ। মাঝে-মাঝে উঁচুদরের মোজেইক আর ফ্রেস্কো।

ত্রিমাত্রিক ছবি ও শিল্পমেলা

হোটেলে ফিরে ডিনার-পর্ব চুকিয়ে বেরোনো হল ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে। বাড়িটা খুব পুরোনো; এটা ঠিক পাকা ছবিঘর নয়। সম্ভবত ছবিটা ছিল

পরীক্ষামূলক। যে ছবি আমাদের দেখানো হল তার ত্রিমাত্রিক চরিত্র মাঝে-মাঝে বেশ উপলব্ধি হচ্ছিল। কিন্তু দেখবার সময় ছবির দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে মাথা নাড়িয়ে দৃষ্টিকোণ পাল্‌টে নিতে হয়। তাতে বেশির ভাগ সময় ফল আশানুরূপ হয় না। সকলেরই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। কয়েকটি ছবি দেখবার পর হোটেলে ফেরা হল।

১.৯.৫৪। ব্রেকফাস্ট সেরে সকালে শিল্পমেলা দেখতে গিয়ে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হল। বিরাট এলাকা জুড়ে প্রদর্শনীর পাকাবাড়ি। ছিয়াত্তরটি প্রকাণ্ড প্যাভিলিয়ান। এক-এক প্যাভিলিয়ানে সোভিয়েটের এক-এক অঞ্চলের কৃষিজাত, খনিজ, কলকারখানার তৈরি বিচিত্র জিনিসের এবং পালিত পশুর বিরাট সমাবেশ। এছাড়া একটি কেন্দ্রীয় প্যাভিলিয়নে সব জায়গার সেরা জিনিসগুলো বাছাই করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যে প্যাভিলিয়নেই যাওয়া যাক না কেন, ভিতরে বাইরে আপাদমস্তক জুড়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রকলার নিদর্শন। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি এই নিয়ে রীতিমতো মুশকিলে পড়ে যেতে হয়। উজবেকিস্থানের প্যাভি-লিয়নে বিপুল পরিমাণে টাটকা ফলমূল আর খেতের ফসল সাজানো রয়েছে। আগে জানাই ছিল না যে আঙুর কিম্বা আপেলের এত রকমের জাত আছে। মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করছে সমস্ত জায়গাটা।

ডজন দুই ক্যামেরা ফোটো আর ফিল্ম তোলবার জন্যে সমস্তক্ষণ আমাদের তাড়া করে ফিরছিল। তাদের সঙ্গে ছিল বিদ্যুত যোগান দেবার গাড়ি। সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড স্পটলাইট।

যন্ত্রপাতির প্যাভিলিয়নে দেখলাম নানারকমের ট্র্যাক্টর, কম্বাইন হার-ভেস্টার, মোটরগাড়ি, আরো কত কি। মোটরগাড়ি খুব বেশি রকমের না থাকলেও বেশ উঁচুদরের। জিম আর জিস গাড়িগুলোতে চড়তে আরাম।

কয়েক বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে একটা প্রদর্শনী করতে লেগেছে মোটে আড়াই বছর। চারদিকে সুন্দর-সুন্দর নকশার ফোয়ারা। দেখে মনে হয় নন্দনকাননে এসেছি। রোজ লাখখানেক লোক প্রদর্শনী দেখতে আসে। এ থেকে সরকারের আয় হয় মাথাপিছু এক রুবল।

রাত্রে বল্‌শই থিয়েটারে অপেরা। 'ইভান সুশান'-এর দেশাত্মবোধক কাহিনী অবলম্বন করে এই অপেরাটি তৈরি হয়েছে।

ইভান সুশান ছিলেন রুশদেশের একজন চাষী। একবার পোল্যাণ্ড থেকে রাজার লোকেরা এসেছিল রুশদেশ জয় করতে। ইভানকে তারা ধরল মস্কোর রাস্তা বলে দেবার জন্যে। রাস্তা দেখাচ্ছি বলে ইভান তাদের নিয়ে গেল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। তারপর বলল, 'এখান থেকে কোনো মানুষ কোনোদিন শহরে ফিরতে পারেনি।' পোল্যাণ্ডের রাজপুরুষেরা ইভানকে তখনই খুন করল। ঠিক সেইদিন তার বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ে এক বীরের সঙ্গে। শেষ দৃশ্যে তাদের দেখা গেল পোল্যাণ্ডের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ক্রেমলিনে এক বিরাট জনতার উৎসবে গলায় গলা মিলিয়ে তারা ইভানের জয়গান করছে।

এক-এক দৃশ্যে দুশো-তিনশো লোক। তারা দিব্যি গান গাইছে, অভিনয় করছে। অপেরাটি যে বেশ উঁচুদরের তা বুঝতে দেরি হল না। পোল্যাণ্ডের রাজসভার দৃশ্যে দু-ডজন নৃত্য-শিল্পী জোড়ায়-জোড়ায় অত্যন্ত দ্রুত ছন্দে নিপুণভাবে নেচে চলেছে। প্রত্যেক শিল্পীর প্রত্যেকটি গতিভঙ্গি যেন একেবারে নিখুঁতভাবে মাপা।

স্টেজের নিচে অর্কেস্ট্রা। বাজাচ্ছে আশীজন বাদক। তার তালে-তালে কয়েকশো লোককে নাচতে হচ্ছে, গাইতে হচ্ছে। অথচ কোথাও একটু ভুলচুক নেই, অসঙ্গতি নেই। শেষ দৃশ্যে যখন স্টেজের উপর পাঁচশো লোক আর দুটো তেজী ঘোড়া এসে ভিড় করে দাঁড়াল—আমরা বিস্ময়ে হতবাক হলাম।

দ্বিতীয় আসর

সকালে দূতাবাসে প্রাতরাশ। মাননীয় কে. পে. এস. মেনন সবাইকে খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। বেতারে এবং আরো কয়েক জায়গায় আমাদের কেউ-কেউ যাতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তার জন্যে একটা প্রস্তাব এসেছিল। তাতে এও বলা হয়েছিল যে, তার জন্যে অর্থ দেওয়া হবে। সাংস্কৃতিক সূত্রে আনন্দ দানের বদলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে আমরা রাজী নই—শ্রীযুক্ত মেননের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমরা একমত হলাম। তবে সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত মেনন এও বলে দিলেন যে, ভারতীয় দলের সবাইকে যখন যা উপহার হিসেবে দেওয়া হবে তা যেন আমরা বিনয়নম্র চিত্তে গ্রহণ করি। মস্কো ছাড়বার আগে সোভিয়েট সরকারের সংস্কৃতি

দপ্তর থেকে বলা হল, আমরা যাতে আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে যেতে পারি তার জন্য দলের প্রত্যেককে তিন হাজার রুবল করে দেওয়া হবে। এত মোটা টাকার অঙ্কে আমরা রাজী হলাম না। শেষকালে বলে কয়ে মাথা পিছু এক হাজার টাকায় অংকটা নামানো হল।

এ ছাড়াও মস্কো আর অন্যান্য ইউনিয়ান থেকে আমরা কম উপহার পেলাম না। ভালোবাসার দানে আমাদের ঝুলিগুলো ভারি হয়ে উঠল।

হোটেলে ফিরে তখুনি আবার হল্ অব কলাম্স্-এ ছুটতে হল মহলা দিতে।

হল্ অব কলাম্স্-এ স্টেজ আছে। স্টেজের দুপাশে না উইং না কিছু। সামনেটা একেবারে ফাঁকা। পিছনের দিকে একটা পর্দা। তার পিছন দিয়ে আসতে-যেতে হবে। যখন নাচের আসর তখন স্টেজ সম্পূর্ণ খালি। সঙ্গীত অনুষ্ঠানের সময় যখন এক বা একাধিক শিল্পীকে বসে গাইতে বা বাজাতে হবে, তখন সহযোগী কর্মীরা চাকাওয়ালা একটি পাটাতন টেনে আনতেন। তাতে আছে দু-সারিতে বসবার ব্যবস্থা। অনুষ্ঠান শেষ হলে সেটাকে স্টেজের পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এইভাবে একাধিক স্টেজে না থেমে পরের পর আমাদের অনুষ্ঠান করে যেতে হয়েছে। এর জন্য প্রচুর রিহার্সাল দিতে হয়েছিল।

মহলা সেরে হোটেলে ফিরলাম সাড়ে-চারটেয়। দ্বিতীয় আসরের জন্যে ছটা বাজতেই হল্ অব কলাম্স্-এ গিয়ে হাজির হতে হল।

আজকের অনুষ্ঠান ভালোই হল। বিশেষ করে, রবিশঙ্করের সেতার। তাঁর বাজনা বল্শই-এর চেয়েও এখানে ঢের বেশি উতরে গেল। রবিশংকর যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারের যন্ত্রবাদক এ কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আট-দশ মিনিটের মধ্যে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের আলাপ ও জোড়ের কাজ সেরে গৎ বাজিয়ে জমিয়ে দেওয়া এবং সমস্ত সঙ্গীত-প্রস্তুতির মধ্যে কোথাও কোনো অনুক্রম ভঙ্গ হয়েছে কিনা এ কথা চিন্তা করবারও অবকাশ না দেওয়া—তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসামান্য মাত্রা-জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়।

কিষেণ মহারাজ কাবুল থেকে আজ এসে পেঁৗছুলেন। কিন্তু পথ-শ্রমের জন্যে আজ তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হল।

এই হল্-এর স্টেজের উপরে প্রথমে লেনিন এবং পরে স্তালিনের

শবাধার রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে রাখা হয়েছিল এবং দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা এই স্টেজের সামনে তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

ক্রেমলিনে

৩.৯.৫৪। আজ সকালে আমরা ক্রেমলিনের ভিতর ঢুকে অনেক প্রাচীন ক্যাথিড্রাল এবং আর্ট মিউজিয়াম দেখে এলাম।

প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আছে ক্যাথিড্রালগুলো। কোনোটা পাঁচশো, কোনোটা সাতশো, কোনোটা আবার আটশো বছরের পুরোনো। দরকার বুঝে জায়গায়-জায়গায় সংস্কার করা হচ্ছে। কিন্তু যেখানে হাত দিলে পুরোনো জিনিসের প্রাচীন রূপের হানি ঘটতে পারে, সেখানে তার ক্ষয়ক্ষতি আর জরাজীর্ণতা যেমন আছে তেমনি রেখে দেওয়া হচ্ছে। যেমন, অনেকগুলো ফ্রেস্কো বা তৈলচিত্রের কোনো সংস্কার করার চেষ্টা হচ্ছে না।

অনেক ছবির উপর পুরোনো দিনের জাররা নতুন গদিতে বসে নতুন করে রঙ লাগিয়ে নিয়েছিলেন। এখনকার সোভিয়েট সরকার সেই ধরনের অনেক ছবির উপর থেকে অতি সাবধানে নতুন রঙ তুলে ফেলে ভিতরকার প্রাচীনতর ছবিটি উদ্ধার করেছেন। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে প্রাচীনতর ছবিগুলো মূল্যবান শুধু সেই ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে আঁকা সেণ্ট জর্জের একটি প্রতিকৃতি দেখলাম। আমাদের দেখা দ্বিতীয় ক্যাথিড্রালটি ১৪৭৯ সালে তৈরি। এর সংস্কার করা হয়েছিল ১৯১৫ সালে। এখানেও অনেক আলেখ্য থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর রঙ উঠিয়ে ফেলে সপ্তদশ শতাব্দীর মূল ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। বিভিন্ন ক্যাথিড্রালে আজও রক্ষিত আছে প্রাচীন ধর্মাধিকরণের সোনাদানা এবং আরো নানান ঐশ্বর্য। অনেক আর্চবিশপ আর মেট্রো-পলিটনদের পুরোনো সমাধিও দেখলাম। একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাথিড্রালে অনেক বহুমূল্য প্রাচীন ঐশ্বর্যের নিদর্শন আছে; সেখানে এক সময় জারদের অভিষেক হত।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তৈরি একটি শাদা ক্যাথিড্রালে পিটার-দি-গ্রেট-এর সমাধি দেখলাম। কোনাচে পাথর দিয়ে তৈরি ১৪৯১ সালের একটি প্রাসাদ। সেখানে এককালে বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা করা হত।

ষোড়শ শতাব্দীর তৈরি একটি বিরাট কামান দেখলাম। তার ওজন চল্লিশ টন। তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তৈরি দুশো টন ওজনের প্রকাণ্ড ঘণ্টা দেখে। এটাই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় ঘণ্টা। কিন্তু এই ঘণ্টাটি কোনোদিনই বাজেনি। কেননা তৈরি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা টুকরো খসে পড়ে। শুধু সেই টুকরোটারই ওজন বারো টন।

আর্ট মিউজিয়াম

তারপর আমরা আর্ট মিউজিয়ামে ঢুকলাম। তার মধ্যে সাজানো রয়েছে পুরোনো জারদের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

চোখ ঝলসে-দেওয়া সেই সব জিনিসের মধ্যে আছে: জারদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, নানা রকমের উপহার, যানবাহন, সাজ-সরঞ্জাম, হীরে-জহরত, মুকুট, সিংহাসন, সোনাদানা, মণিমুক্তাখচিত দ্রব্যসম্ভার, কত কোটি-কোটি টাকার যে জিনিস তা ঠিক করে বলা কঠিন। জিনিসগুলো টাকার দিক থেকেই যে শুধু দামী তা নয়, নিখুঁত কারু-কার্যের দিক থেকেও অসামান্য।

অনেকগুলো রাজসিংহাসন দেখলাম। কারুকার্য দেখে অবাক হতে হয়। একটি সিংহাসন পুরো হাতির দাঁতের তৈরি। আর্মিনিয়ার দেওয়া একটি স্ফটিকের সিংহাসন দেখলাম। পারস্যের শাহ একটি সিংহাসন দিয়েছিলেন, তেরো কিলোগ্রাম সোনা দিয়ে তৈরি। পিটার আর ইভান অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় একসঙ্গে একটি জোড়া সিংহাসনে বসতেন।

তাছাড়া নানারকমের কারুকার্য করা বহুমূল্য মুকুট আর টুপি, স্বর্ণখচিত বিচিত্র ঘোড়ার সাজ। জারদের বিশেষ-বিশেষ উৎসবে বহুমূল্য সাজে সজ্জিত হয়ে এক হাজার ঘোড়ার মিছিল বার হত। এক জায়গায় অনেকগুলো ঘোড়া-টানা সুদৃশ্য কোচ আর বরফের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার চক্রহীন গাড়ি।

জাপানী কারিগরদের তৈরি হাতির দাঁতের প্রকাণ্ড একটা ঈগল পাখি। অপূর্ব কারিগরি। প্রত্যেকটি পালক খুলে ফেলে আবার জোড়া লাগানো যায়। রকমারি শখ-শৌখিনতার ঘড়ি। একটি ঘড়ির সঙ্গে আছে সোনা-রুপোর কাজ-করা মিনে-করা ময়ূর; তার মুখ থেকে প্রতি মুহূর্তে একটি করে মোতি বেরিয়ে আসে।

অপূর্ব সুন্দর চীনেমাটির দামী বাসন। পিটার-দি-গ্রেট-এর রানী ক্যাথারিনের রুপোর লেসের পোশাক; শুনলাম পৃথিবীতে তার জুড়ি নেই। এলিজাবেথ-এরও এই ধরনের পোশাক দেখলাম। তাঁর শুধু এই রকমের পোশাকই ছিল পনেরো হাজার।

পুরোনো অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যেও মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। তাছাড়া সোনা-রুপোর থালা-বাসন, দোয়াতদান আর শৌখিন জিনিস তো আছেই।

একটি সোনার ট্রেন। তার ইঞ্জিনটি প্ল্যাটিনামের তৈরি। আকারে অবশ্য খুবই ছোট। একখণ্ড হাতির দাঁত থেকে তৈরি একটি অদ্ভুত হার দেখলাম; তার মধ্যে আছে সাত হাজার চেন কিন্তু কোথাও কোনো জোড় নেই। হাতির দাঁতের এই হারটি তৈরি করতে শিল্পীর চল্লিশ বছর সময় লেগেছিল।

তারপর চিত্রশালায় গেলাম। ১৮১২ সালের একটি ছবি। আগুনের ধ্বংসলীলা। নেপোলিয়ন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছেন।

পিটার-দি-গ্রেট-এর নিজের হাতে তৈরি অনেক জিনিস দেখলাম। পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো, যন্ত্রপাতি। পিটার মাথায় ছিলেন প্রায় সাত ফুট লম্বা। চোদ্দটি শিল্পকলায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজ করা ছিল তাঁর স্বভাব।

ক্রেমলিন থেকে ফিরে কোনোরকমে নাকে-মুখে গুঁজেই আবার হল্ অব কলাম্স্-এ ছুটতে হল। রাত আটটায় অনুষ্ঠান। তার আগে একটু মহলা দেওয়া দরকার।

আজকের জলসা খুব ভালোই হল। ভিড় আগের মতোই। শ্রোতাদের উচ্ছ্বাস আশাতীত রকমের। রাষ্ট্রদূত আজও সপরিবারে এসেছিলেন।

শোনানো এবং শোনা

৪.৯.৫৪। সকালে ছবি তুলতে বার হওয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, ক্রেমলিন, সব চেয়ে বড় এ্যাপার্টমেণ্ট হাউস—এইসব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিস্তর ছবি তোলা হল। ছবি তুললেন সরকারী ফোটোগ্রাফাররা।

তারপর আমাদের সটান নিয়ে যাওয়া হল চেইকভস্কি হল্-এর রিহার্সাল ঘরে। অ'স'ব্‌ল অব ফোক মিউজিক-এর পক্ষ থেকে সেখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হল্‌টি বেশ বড়।

অভিনন্দনের পালা শেষ হবার পর ওঁদের নৃত্যগীত শুরু হল।

প্রাণের কী প্রাচুর্য! দেখে-শুনে অবাক লাগে। অত্যন্ত সুমার্জিত হওয়া সত্ত্বেও রচনা, সুর, ছন্দ আর ভঙ্গিতে লোকপ্রকৃতি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ। নাচের পরিকল্পনাগুলি অসামান্য—বিশেষ করে মেয়েদের নাচের। গানে বীরত্বের ভাব বেশি; সঙ্গে-সঙ্গে আবহসঙ্গীত আর গান (সমবেত কণ্ঠে হওয়া সত্ত্বেও) খুব মৃদু হওয়ায় সবল সতেজ ওজস্বিতার মধ্যে ভারি মধুর হাওয়া-বদল ঘটছিল। পুরুষদের নাচে সার্কাস-সদৃশ অদ্ভুত কসরত; কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশজনের একত্র অঙ্গসঞ্চালনে ও নৃত্য পদক্ষেপে নিখুঁত ছন্দ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিভিন্ন নাচের সময় মেয়েদের পরনে বিভিন্ন পোশাক, অথচ নাচের মধ্যে কোথাও ছেদ নেই। কোন ফাঁকে যে তারা পোশাক বদলে ফেলে বোঝাই যায় না। মেয়েদের কণ্ঠে লালিত্য কম না বলে বরং বলা যায় তাদের গলার স্বরে আছে একটা সতেজ কোমলতা।

একটি নাতিপ্রশস্ত হল্-এ ত্রিশজন ছেলে, ত্রিশজন মেয়ে আর পঁচিশজন যন্ত্রী মিলে একটার পর একটা অনুষ্ঠান করে চলেছে। কোনো ফিসফাস গুঞ্জন নেই, গোলমাল তো নেই-ই। কারো মধ্যে এতটুকু দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। মুহূর্তের মধ্যে শিল্পীরা যে যার জায়গায় চলে যাচ্ছে। আমাদের পক্ষে এ ধরনের প্রযোজনার কথা ধারণা করাও কঠিন। শুধু কয়েকটি দিন, সপ্তাহ বা মাসের রিহার্সালে এ জিনিস সম্ভব হতে পারে না। এর পিছনে দরকার একটা জাতির বহুযুগলব্ধ নিয়মানুবর্তিতার অভিজ্ঞতা।

এদেশের শহর-গাঁয়ে এরকম আরো অনেক অ্সম্বল্ আছে। সেখানে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের চর্চা হয়। যে প্রতিষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে বলে কন্জারভেটয়র।

আজকের অনুষ্ঠানে আমরা যেসব গানের সুর শুনলাম তার চালগুলো খুব সরল এবং জটিলতাহীন। একটি গান শুরু হয়েছে এই সুরে:

{ধ - প স। গ র স স। ম ম গ র। ম - প -}

গানগুলো শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল—এ গান পৃথিবীর যেকোনো দেশেরই হতে পারত। রুশিয়ায় প্রচলিত মার্জিত সঙ্গীতের সঙ্গে চেহারার দিক থেকে এর অনেক তফাত। অন্যদিকে আবার এর সঙ্গে মিল খুঁজে

পাওয়া যায় পৃথিবীর যে-কোনো দেশের লোকসঙ্গীতের। সব দেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যেই আছে একটা সাধারণ আর সরল রূপ।

বলা বাহুল্য, এখানকার ব্যাণ্ডে পিয়ানো কিম্বা চেলো, বেহালা কিম্বা ক্ল্যারিওনেট ব্যবহার করা হয় না। লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন টানা-তারের যন্ত্র। তার আওয়াজ হার্পসিকর্ডের মতো। বালালাইকা নামে একটি চমৎকার যন্ত্র বাজানো হয়। স্কেলের ভিন্নতা অনুসারে এই যন্ত্র ছোট-বড় নানারকমের হয়।

একসঙ্গে অনেকগুলো যন্ত্র যখন বেজে ওঠে চমৎকার শুনতে লাগে। পৃথিবীতে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের স্থান যে খুব উঁচুতে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের সেতার, সরোদ বা বীণ একসঙ্গে একবার বাজানো হোক তো! একেবারে হট্টগোলের সৃষ্টি হবে। অথচ এই লোকসঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে এতগুলো তারের যন্ত্র একসঙ্গে বাজানো হল—সুরের টুকরোগুলো কোথাও পরস্পরকে আচ্ছন্ন করল না।

এই অনুষ্ঠানে ট্রাম্পেট-এর মতো এক ধরনের ফুঁকের যন্ত্র দেখলাম। ব্যাণ্ডের সঙ্গে বাজছিল ম্যাণ্ডোলিন-এর মতো একরকমের যন্ত্র। একটি যন্ত্র ছিল ঠিক সানাইয়ের মতো। খটখট ঝমঝম আওয়াজ দিয়ে ছন্দ সৃষ্টি করাবার কয়েক রকমের যন্ত্র দেখলাম। আর আছে ছোট-বড় কাঠি বা হাত দিয়ে বাজাবার ড্রাম। শিঙার মতো এক ধরনের যন্ত্র বাজছিল। লোকসঙ্গীতে যেসব যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে বোধহয় সব চেয়ে দামী যন্ত্র হল এ্যাকর্ডিয়ান। নব্বইজন শিল্পীদের এই অনুষ্ঠানে ছিল চারটি এ্যাকর্ডিয়ান।

অনুষ্ঠান শেষ হলে পর ওঁদের বিশেষ অনুরোধে আশা সিংহ দু-একটি পাঞ্জাবী লোকসঙ্গীত গেয়ে শোনালেন এবং গোপীনাথ দেখা-লেন দক্ষিণদেশীয় নাচের কিছু মুদ্রা। উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হলেন।

সঙ্গীত এ্যাকাডেমি

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে আবার বেরিয়ে পড়তে হল। এবার আমরা গেলাম মস্কোর সঙ্গীত এ্যাকাডেমিতে।

অনেক নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরস্রষ্টাদের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাচেতুরিয়ান্ (সুরকার), হিউবার্ট (সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞ),

রেনিকভ (সুরকার), মাকারা (কাচেতুরিয়ান-এর স্ত্রী; নিজে একজন সুরস্রষ্টা)।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ওদেশের সঙ্গীতজ্ঞেরা অনেক কিছু জানতে চান। তাই এই মেলামেশার ব্যবস্থা। দোভাষীদের সাহায্যেই আমাদের কথাবার্তা চলছিল।

ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এদেশের শিল্পীরা যেসব প্রশ্ন করলেন তার উত্তর দেবার ভার পড়েছিল রবিশঙ্করের উপর। তাঁর সঙ্গে সুর বাজিয়ে উদাহরণ দেবার কাজ করলেন নারায়ণস্বামী (দক্ষিণী বীণা), কিষেণ মহারাজ (তবলা) ও শকুর খাঁ (সারেঙ্গী)।

রুশসঙ্গীত সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে কাচেতুরিয়ান যা বললেন তার মর্ম এই যে, রুশদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সাধারণ ইউরোপীয় সঙ্গীতেরই সহধর্মী; কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের কৃষ্টির ফলে একটা বিশেষত্ব যে অর্জন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আধুনিক সুরস্রষ্টারা দরকার মতো লোকসঙ্গীত থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করেন।

সব শেষে সকলের অনুরোধে কাচেতুরিয়ান পিয়ানোতে তাঁর নিজের দু-একটি রচনা বাজিয়ে শোনালেন।

রাত্রে বল্‌শই থিয়েটারে একটি ব্যালে দেখলাম—'ব্রোঞ্জের তৈরি ঘোড়সওয়ার'। মঞ্চের উপর এরকম অদ্ভুত কেরামতি, আশ্চর্য নৃত্যকৌশল আর সূক্ষ্ম ভাব অভিনয় দেখব কল্পনাও করতে পারিনি।

চোখের সামনে ঝমঝম করে মুষলধারে বৃষ্টি। চমকে-চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। আর ঝড়ের প্রচন্ড বেগ। তার মধ্যে নদীতে ডেকে উঠল বান। ফুলতে-ফুলতে জল একতলার সমান উঁচুতে উঠল। তারপর স্রোতের টানে ভাসতে-ভাসতে গেল ভারি-ভারি জিনিস। একটা প্রকান্ড নৌকো ভেসে এল বিপন্নদের উদ্ধার করতে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না এমন সব দৃশ্য।

আর সেইসঙ্গে অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতানুষঙ্গ বাস্তবিকই সুরের এক মায়াজাল সৃষ্টি করে।

শেষ অঙ্কের আগে আমরা স্টেজের ভিতরে গিয়ে নৃত্যনাট্যের রচয়িতা, পরিচালক, সঙ্গীত রচয়িতা, নায়ক-নায়িকা এবং চারবার স্টালিন

প্রাইজপ্রাপ্ত অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টর ফায়ার—এঁদের সকলের সঙ্গে দেখা করি।

মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড

৫.৯.৫৪। সকালেই গোছগাছ করে নিতে হল। আজ রাত্রের জলসার পরই আমাদের লেনিনগ্রাডে পাড়ি দিতে হবে।

আজ একটা নতুন অনুষ্ঠানের জন্যে দুপুর থেকেই কিষেণ মহারাজ, কৃষ্ণ পিল্লে আর আমি রিহার্সাল দিয়ে নিলাম। তাল-বাদ্য-কাছেরীর এই অনুষ্ঠানে বাজবে দক্ষিণী মৃদঙ্গ আর জোড়া বাঁয়া।

লাঞ্চের পর লটবহরসুদ্ধ হোটেল থেকে সটান আমরা হল্ অব কালাম্স্-এ এসে উঠলাম।

আজকের জলসাও ভালোই জমল। দর্শকের ভিড় একটুও কমেনি। জলসা শেষ করে আমরা গেলাম বল্শইতে ব্যালে দেখতে।

একজন খানের কাহিনী। লড়াই আর প্রাসাদে আগুন লাগার দৃশ্যগুলো দেখবার মতো। সেণ্ট্রাল বক্সের ঠিক গায়েই বিশ্রামাগার। সারি-সারি ডিনারের টেবিল পাতা। ব্যালে শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা সেখানে গেলাম। বল্শই থিয়েটারের প্রত্যেকটি বক্সের সঙ্গে একটি করে সুসজ্জিত বিশ্রামকক্ষ আছে। অডিটোরিয়াম এবং এই থিয়েটারের সমস্ত কক্ষ লাল রঙের দামী মখমল দিয়ে মোড়া, তার উপর সোনালী কারুকার্য। লাল আর সোনালী যেন বল্শই-এর প্রতীক।

মস্কোতে আমাদের প্রথম পর্ব শেষ হতে চলেছে। ডেপুটি মিনিস্টার কাফটানফ এসেছিলেন আমাদের বিদায় অভিনন্দন দিতে। ডিনার চলতে লাগল। আজ রাত্রের ব্যালেতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের প্রীতি ও আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করল।

বিদায় নেবার সময় টের পেলাম মাত্র এই কদিনের মধ্যেই আমরা এখানকার অসংখ্য মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছি। মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যাঁরা আমাদের অকাতরে সাহায্য করেছেন, শহর দেখাবার জন্যে যাঁরা দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গে ঘুরে কষ্ট স্বীকার করেছেন—তাঁদের ছেড়ে যেতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল।

বল্শই থেকে যে জায়গাটায় আমরা এসে পেঁছালাম তার নাম

রেলওয়ে স্টেশন। আমাদের এনে তোলা হল একটা প্রাসাদ বাড়ির প্রকাণ্ড হল্-এ। চারদিকে সুদৃশ্য আসবাবপত্র। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার শোভা দেখতে লাগলাম। কোথাও ভিড় নেই, ছুটোছুটি নেই।

এখানেই আমরা প্রথম টেলিভিশান দেখলাম। টেলিভিশান-এর ব্যবস্থা সাধারণত ত্রিশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এদেশে রীলে করবার অনেকগুলো ঘাঁটি বসিয়ে টেলিভিশান-এর দূরত্ব পাঁচশো মাইল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

একে-একে আমরা ট্রেনে উঠলাম। ভারি চমৎকার ব্যবস্থা। এক-এক কামরায় উপর-নিচে দুজন করে যাত্রী। প্রত্যেক কামরার পাশ দিয়ে চলে গেছে লম্বা বারান্দা। প্রত্যেক কামরার মাথার উপর করিডোর-এর ছাত পর্যন্ত বিস্তৃত মালপত্র রাখার সিলিং।

বিছানার উপর ধবধবে চাদর আর বালিশ, পাট-করা নরম কম্বল। প্রত্যেকটি কামরায় দেয়াল-আলো, টেবিল-আলো, রেডিও। গোটা ট্রেনটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। টেবিলের উপর ফল, স্যাণ্ডউইচ, লেমোনেড শুধু সদ্ব্যবহারের অপেক্ষা করছে। রাত্তিরে যেসব ট্রেন চলে, তার সবগুলোতেই এই এক ব্যবস্থা। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস বলে কিছু নেই।

ট্রেনে একেবারেই কোনো ঝাঁকুনি নেই। ট্রেনের গতি কোনো সময়েই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে না। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

লেনিনগ্রাড শহরে

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ লেনিনগ্রাডে পেঁাছে গেলাম। ট্রেনে আসতে-আসতে সকালের আলোয় যতদূর দৃষ্টি গেল আগাগোড়া শুধু সবুজ আর সবুজ। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতোই এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রোদ্দুর উঠতে না উঠতে কামরায়-কামরায় হানা দিয়ে ফিরতে লাগলেন সরকারী ফোটোগ্রাফারের দল। লেনিনগ্রাডে নেমে যথানিয়মে চলল দু-তরফা অভিভাষণ আর অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা।

৬.৯.৫৪। হোটেল এ্যাস্টোরিয়াতে এসে আমরা সদলবলে উঠলাম। পুরোনো হলেও হোটেলটি উঁচুদরের।

চারতলায় আমার ঘরের জানলার সামনে চারদিক খোলা, বিরাট

একটা তেমাথার মাঝখানে গোল পার্কের মতো। ডানদিকে প্রকাণ্ডকায় আইজ্যাক্‌স ক্যাথিড্রাল।

সকালের জলযোগ সেরে আমরা গেলাম আর্ট মিউজিয়াম দেখতে। আমাদের ঘুরবার জন্য আলাদা একটা বাসের ব্যবস্থা হয়েছে।

কী সুন্দর-সুন্দর সব ছবি! দ্বাদশ শতক থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত রুশ চিত্রকর ও ভাস্করদের অপূর্ব কলা-নৈপুণ্যের নিদর্শন। ছবিগুলো আকারেও যেমন বিরাট, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তেমনি মহৎ। সব যেন জীবন্ত, ধরা-ছোঁয়া যায়। ছবি বলেই মনে হয় না।

লাঞ্চের পর বাসে করে আবার বেরুনো হল শহর দেখতে। ফোটোগ্রাফাররা পিছনে-পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছে।

শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ফিনিশ্‌ গাল্‌ফ-এর তীরে খুব উঁচু একটা ঢিপির উপর লেনিন স্টেডিয়াম। চারদিকে বড় সুন্দর দৃশ্য। ঢিপিটাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠেছে গাড়ি-চলার রাস্তা, স্টেডিয়ামের একেবারে চূড়োয় গিয়ে বাস থামল। সামনে সমুদ্রের বিস্তার আর তার কিনারে-কিনারে সুন্দর দৃশ্য। চারদিকে কেমন একটা উদার শান্ত ভাব—যেমন দেখেছি মহাবলীপুরমে কিম্বা কন্যাকুমারিকায়।

স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক আসন। এক জায়গায় লেনিনের একটি বিরাট প্রতিকৃতি। আজ শুনলাম মস্কোর সঙ্গে লেনিনগ্রাডের ফুটবল ম্যাচ। দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময়াভাবে দেখা হল না। ঘোরানো রাস্তায় আমাদের নিয়ে বাস নামতে লাগল। রাস্তার মাঝখানে-মাঝখানে চা, ফল, পানীয় এবং রকমারি জিনিসের স্টল। সুন্দর করে সাজানো।

ঘুরে-ঘুরে শহরের আরো অনেক কিছু দেখলাম। লেনিনগ্রাডের ছকটি বড় সুন্দর। সারা শহর জুড়ে নিভা নদীর শাখা-প্রশাখা। শহরের মধ্যেই পারাপার করবার একশোটি পুল। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি সব মস্কোরই মতো। তবে এখানে পুরোনো দালান-কোঠা প্রায় নেই বললেই হয়। এমন কিছুই নজরে পড়ল না যা চোখকে পীড়া দেয়।

ডিনারের পর স্মল্‌ অপেরা থিয়েটারে অপেরা আর ব্যালে দুইই দেখলাম। থিয়েটারটি বল্‌শই-এর অনুকরণে তৈরি। তবে অনেক ছোট। বল্‌শই সাততলা, এটি পাঁচতলা। অর্কেস্ট্রায় যন্ত্রবাদকদের সংখ্যাও

বল্‌শই-এর চেয়ে কম, জন ষাটেক হবে। ব্যাস্‌ন আর হারপ্‌ দ্‌টো-দ্‌টো করেই আছে। ব্যালের সময় একজন মহিলা অর্কেস্ট্রা কণ্ডক্ট্‌ করলেন। এখানকার শো খ্‌ব ভাল সন্দেহ নেই, তবে বল্‌শই-এর শো আরো ভালো।

বল্‌শই-এর অর্কেস্ট্রা-কণ্ডক্টার ফায়ার-এর কথা মনে পড়ল। ভদ্র-লোকের বয়স হয়েছে, চোখে কম দেখেন। তাই সামনে স্বরলিপি না রেখে সম্প্‌র্ণ স্ম্‌তিশক্তির জোরেই তিনি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড অর্কেস্ট্রা চালিয়ে যান।

জলসা ভাঙবার পর অপেরার রাজা, অন্ধ-কন্যার পিতা উপরে এসে দেখা করে গেলেন। এ'রা যেমন অমায়িক, তেমনি বিনয়ী। অথচ দেশজোড়া এ'দের নামডাক।

৭.৯.৫৪। কদিন ধরে সমানে সর্দি-কাশিতে ভুগছি। রাত্রে ঘ্‌মও ভালো হয়নি। ব্রেকফাস্টে গেলাম না। দলের সেক্রেটারি বিক্রম সিংহ এসে খবর নিয়ে গেলেন।

সবে স্নান সেরে বেরিয়েছি, একজন মহিলা-ডাক্তার এলেন দেখতে। ব্‌ক, পিঠ, গলা সমস্ত পরীক্ষা করা হল। তারপর এক ইয়া মোটা থার্মো-মিটার বার করলেন জ্বর দেখবার জন্যে। থার্মোমিটারটি পাকা দশ মিনিট বগলের নিচে রাখতে হল। বললাম, আমাদের দেশে জ্বর দেখতে এত সময় লাগে না। ডাক্তার বললেন, খ্‌ব বেশি জ্বর থাকলে কম সময়েই থার্মোমিটারে ঠিক-ঠিক ওঠে, কম জ্বর হলে বেশিক্ষণ রাখতে হয়—তবেই জ্বরের মাত্রা সঠিক বোঝা যায়। যাবার সময় ওষ্‌ধ দিয়ে গেলেন। এ-ছাড়া হেনরিয়েটার দেওয়া পেনিসিলিন লজেঞ্জ এবং এক রকমের পেনিসিলিনের শাদা নস্য—তাও চালাতে বললেন।

ঘর থেকে বার হওয়া বারণ। ঘরেই খাওয়া-দাওয়া, ঘরেই শ্‌য়ে থাকা।

কিন্তু হাজার-হাজার মাইল দ্‌রে এসেছি। কত কী দেখবার আছে। শরীর খারাপ বলে যদি ঘরে বসে থাকি তাহলে দেশে ফিরে আপসোসের আর সীমা থাকবে না। একেই তো সকালে বিক্রম সিংহের কথা শ্‌নে দঙ্গলের সঙ্গে থিয়েটারের হল্‌ আর স্টেজ দেখতে বেরোইনি।

তাই লাঞ্চের পর নাছোড়বান্দা হয়ে দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম শীতপ্রাসাদ বা হার্মিটেজ-এ আর্ট মিউজিয়াম দেখতে। এখানকার এই

আর্ট গ্যালারি শ্রেষ্ঠত্বে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। বিরাট-বিরাট হল্‌-ভর্তি ছবি আর ভাস্কর্য। হল্‌-এর গায়ে আশ্চর্য সব কারুকার্য। দামী পাথরের টুকরো জমিয়ে তৈরি রঙিন আসবাবপত্র দেখে চোখ ঝলসে যায়। যেসব জিনিস ভালো করে দেখতে কয়েক মাস লাগবার কথা, সেখানে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে হাঁপাতে-হাঁপাতে আমাদের সব কিছু দেখে নিতে হল। দেখবার পর মনের মধ্যে জেগে থাকল শুধু অনির্দিষ্ট বিস্ময়কর অনুভূতি।

জারদের আমলে এটা ছিল শীতকালীন প্রাসাদ। রুশ বিপ্লবের পর এই প্রাসাদটি রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায় রূপান্তরিত হয়। এই চিত্রশালায় ছবি এবং দেখবার অন্যান্য যা জিনিস আছে, সব মিলিয়ে সংখ্যায় হবে কুড়ি লক্ষ। সোনা দিয়ে মোড়ানো দুই বিরাট ঝাড় আছে। প্রাসাদের মধ্যে হল্‌-এর সংখ্যা তিনশো-এক। প্রত্যেকটিতেই ছবি এবং নানারকমের প্রদর্শনীর জিনিস ঠাসা। এমব্লেম হল্‌ নামে একটি হল্‌ আছে, দু-হাজার লোকের সভা হতে পারে। এই হল্‌-এ নানা যুগের রাষ্ট্রীয় পতাকা সাজানো আছে। একটি হল্‌ আছে নেপোলিয়ন-এর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের স্মারক হিসেবে। আরেকটি হল্‌-এ সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রকাণ্ড একটা মানচিত্র দেখলাম। পঁয়তাল্লিশ হাজার দামী পাথর দিয়ে তৈরি এই বহুবর্ণ মানচিত্রটি কারুকার্যের দিক থেকে অসামান্য। দোতলায় বিরাট একটি বাগান। মূল্যবান ধাতু আর পাথরের নানারকম শৌখিন আসবাব।

নানা ক্যাথিড্রাল থেকে সংগৃহীত চতুর্দশ শতাব্দীর অনেক আইকন অর্থাৎ ধার্মিক প্রেরণার প্রতিকৃতি দেখলাম।

তা ছাড়া ঘরে-ঘরে আছে পৃথিবী-বিখ্যাত চিত্রকরদের নামকরা মূল ছবি। দেখতে-দেখতে রোমাঞ্চ লাগে। এঞ্জেলিকো, দা ভিঞ্চি, র‍্যাফায়েল, টিসিয়ান, মিকেল এঞ্জেলো, ভ্যান ডাইক, রেমব্রাণ্ট, রুবেন্‌স্‌—প্রত্যেকেরই স্বহস্তে আঁকা ছবি আছে। আর আছে ফ্যালকনের ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন—তরুণ কিউপিড; আছে ভল্‌টেয়ারের মর্মর প্রতিমূর্তি।

আধুনিকদের মধ্যে আছে পিকাসো, গগ্যাঁ, মোনে, রেনোয়া, ডেগা, ভ্যান গো-র আঁকা ছবি।

পিটার-দি-গ্রেট-এর নিজের হাতে তৈরি যন্ত্রপাতি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। মাথায় সাত ফুট লম্বা পিটার চার ফুট উঁচু যে টেবিলে

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজ করতেন, সেই টেবিলটা একটি ঘরে রাখা আছে।

হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। শরীরটা বেজায় খারাপ লাগছিল। দুধের সঙ্গে মিনারাল ওয়াটার মিশিয়ে খেয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। মস্তানা আর গোপীনাথ এসেছিল খবর নিতে। রাত্রে সবাই অপেরা দেখতে গেল। সারা ভ্রমণপর্বে এই একটি জিনিস থেকেই বঞ্চিত হলাম।

পিটার-এর উদ্যান

সকাল সাতটায় উঠে দেখি সারা রাত ঘরে আলো জ্বালানো ছিল।

সারাটা সকাল আজ দল বেঁধে আমরা কাটালাম পিটার-এর প্রাসাদে। লেনিনগ্রাড থেকে কুড়ি মাইল দূরে মস্ত বড় বাগানের মতো একটা জায়গা। ঘুরে দেখতে অনেক সময় লাগে। এই প্রাসাদ তৈরি শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়, শেষ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। পিটার-এর আমলে সুইডেন-এর সঙ্গে দীর্ঘ বিশ বছরের যুদ্ধে জয়ের স্মারক হিসেবে এই বাগান-ঘেরা প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল।

এক সময়ে এই বাগানের মধ্যে ছিল দশটি প্রাসাদ এবং একশো-অষ্টআশীটি ফোয়ারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী জার্মানদের আক্রমণে এর অনেক কিছুই ভেঙেচুরে যায়। যুদ্ধের পর দুটি প্রাসাদ এবং একশো-পঁচিশটি ফোয়ারা সংস্কার করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এখানে অনেক সব মজার-মজার ফোয়ারা দেখলাম। একটি ফোয়ারা আছে, দেখতে ঠিক পিরামিড-এর মতো। পাঁচশো নল লাগিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন চাপে জল ঠেলে বার করে জলের স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে।

এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা ছাতা। মনে করুন আপনি তার নিচে দিয়ে যাচ্ছেন। ছাতাটা পেরিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ চতুর্দিক থেকে চক্রাকারে মুষলধারে জল পড়তে শুরু করে দিল। যদি ভিজতে না চান তাহলে আপনাকে ছাতার নিচে দাঁড়াতেই হবে। আমাদেরও সেই অবস্থা হয়েছিল। ছাতাটির চারপাশে কায়দা করে অসংখ্য নল লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওর নিচে গিয়ে দাঁড়ালেই জল ছেড়ে দেওয়া হবে। ওর নাম 'চীনে ছাতা।'

আরো একটি মজার ফোয়ারা দেখলাম। এক জায়গায় সবুজ ডাল-পালা মেলে আছে কয়েকটি গাছ। তার নিচে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। হঠাৎ

কয়েকটি গাছ পিচকিরির মতো চারদিক থেকে জল ছুঁড়তে শুরু করল। আমরা তো পালাতে পথ পাই না। পরে শুনলাম ওই গাছগুলোর মধ্যে কয়েকটা হল জলের নলওয়ালা নকল গাছ। তামার পাত দিয়ে তৈরি। এমন ভাবে রঙ করা হয়েছে যে বাইরে থেকে বুঝবার যো নেই। অনেকক্ষণ ধরে খুব হৈচৈ করে কাটানো গেল।

রাত্রে জলসা। সন্ধ্যের আগে স্টেজে পেঁছাতে হল। আজ আর আমি তবলা বাজালাম না। তবলা বাজালেন কিষেণ মহারাজ। আমি শুধু সমবেত গানে গলা মেলালাম।

হোটেলে ফিরতে বেশ রাত হল। খেয়ে-দেয়ে শুয়েছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা। উঠতে হল। দেখি হেনরিয়েটা। তার হাতে মাস্টার্ড প্ল্যাস্টার বা আমাদের স্বদেশী বেলেস্তারা। ওর নিজের শরীর একে ভালো নয়, তার উপর সকাল থেকে রাত অবধি অনবরত আমাদের ফাইফরমাশ খাটছে। নানারকমের অজুহাত দেখিয়ে ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলাম। কিছুতেই শুনল না। অনেক কাণ্ড করে ও নাকি এই অব্যর্থ পুলটিশ যোগাড় করেছে, যা সে এইমাত্র আরো দু-চার জনের উপর প্রয়োগ করে আসছে। কাজেই এর নিশ্চিত সুফল থেকে আমাকে ও কিছুতেই বঞ্চিত হতে দেবে না। অগত্যা বুকে-পিঠে পুলটিশ লাগাতেই হল। জ্বালার চোটে একটু ছটফট করব, উঃ-আঃ করব সে উপায়ও নেই। পাছে পনেরো মিনিটের আগে পুলটিশ খুলে ফেলে ওর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করে দিই সেই ভয়ে হেনরিয়েটা আমাকে কম্বলচাপা দিয়ে মোক্ষম ভাবে ঠেসে ধরে রইল।

অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে হেনরিয়েটাকে রাত্রের বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। কেবলই মনে হতে লাগল, সব দেশের মানুষের মধ্যেই কোথায় যেন একটা আশ্চর্য মিল আছে। দূরদেশে এসে এক রুশ দোভাষিণী মহিলার কাছে এমন আত্মীয়ের মতো সেবা পাব ভাবতেও পারিনি।

শিশুমঙ্গল গবেষণাগার

৯.৯.৫৪। আজ সকালে এমন একটি প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম যে-ধরনের প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে কোথাও আছে বলে জানি না। প্রতিষ্ঠানটির নাম পিডিয়াট্রিকস ইনস্টিটিউট।

জন্ম থেকে শুরু করে মাসে-মাসে বাচ্চাদের শরীর আর মনের কি ভাবে বদল হয়, সে সম্বন্ধে এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষার বিস্তারিত ব্যবস্থা আছে। এটি একাধারে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান এবং শিশু-বিষয়ক গবেষণাগার।

এখানকার যিনি প্রধান অধ্যক্ষ ও যিনি প্রধান চিকিৎসক, দুজনেই মহিলা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এ'দের কাছে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনেক কিছু শুনলাম।

১৯১৭ সালের আগে রুশদেশেও প্রসূতিদের বিষয়ে কেউ বড় একটা চিন্তা-ভাবনা করতেন না। লেনিন প্রথম এ ব্যাপারে হাত দেন। লেনিনগ্রাডের এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে। গোড়ায়-গোড়ায় এখানে শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণাই চলত। পরে বিশেষজ্ঞ তৈরি করবার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়।

এ'দের কাছে শুনলাম, ওদেশে প্রতি বছর গড়ে ত্রিশ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়। গবেষণা করে যে ফল পাওয়া গেছে তাতে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এক-একটি জাতককে দেড়শো বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায়। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অকালজাত (ছ-মাস পর্যন্ত) শিশুদের মৃত্যুনিরোধ, চিকিৎসা, লালনপালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চা এবং আরো নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালনা করবার অতি উন্নত ধরনের ব্যবস্থা আছে।

অনাথ শিশুদের এ'রা স্বাস্থ্যবান নাগরিক করে গড়ে তোলেন; তাদের জীবনে কোনো কিছুর অভাব আছে বলে তারা বুঝতেই পারে না। মা-মরা শিশুদের জন্যে আছে স্তন্যদুগ্ধের ব্যবস্থা।

এক হাজার শিশুর একটি বিভাগ আমরা ঘুরে দেখলাম। সেখানে যেমন একদিকে মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান অনুযায়ী লালনপালন করা হয়, তেমনি আবার লেখাপড়া শেখাবার জন্যে সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রও আছে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করা হয়, কিন্তু তার চিকিৎসার সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষাও চলতে থাকে। ফলে যখন সে সুস্থ হয়ে আবার সকলের সঙ্গে ক্লাশে যায় তখন পড়ার দিক থেকে তাকে পিছিয়ে পড়তে হয় না।

এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞের শিক্ষা পান প্রায় দু-হাজার তিনশো ছাত্র-ছাত্রী। এখানকার কর্তৃপক্ষ চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ আনকোরাদেরই

বেশি পছন্দ করেন। এই বিশেষ শিক্ষার পর অবশ্য তাঁদের চিকিৎসাবিদ্যাও শিখতে হয়। আধঘণ্টা ধরে নানারকমের তথ্য শুনবার পর আমরা একটি অকালজাত শিশুদের বিভাগ দেখতে চললাম। তার আগে আমাদের শাদা গাউন আর টুপি পরে নিতে হল।

অনেক শিশুকে দেখলাম, তারা ছ'মাসে কিম্বা সাড়ে-ছ'মাসে হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখলাম যাদের বয়স এখন চার কিম্বা পাঁচ মাস। দিব্যি স্বাস্থ্যবান। অকালজাত শিশু বলে মনেই হয় না। জন্মের ঠিক পরমুহূর্ত থেকে কী অপরিসীম যত্ন, সাবধানতা এবং তৎপরতার সঙ্গে এদের মানুষ করা হচ্ছে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সন্তানদের মা-বাবা গণ্যমান্য না নগণ্য—সেসব এখানে দেখা হয় না। এখানে শিশুর সব থেকে বড় পরিচয়—সে মানব-সন্তান, অকালে যেন সে প্রাণ না হারায়।

পৃথিবীতে অকালজাত যেসব শিশু পরবর্তী জীবনে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের তালিকার মধ্যে পড়েন ভলটেয়ার, নিউটন, [illegible]স্টাইন, ভিক্টর হিউগো, রুশো।

এখানকার হাসপাতালে বিশ্রামরত অবস্থায় তিনটি অকালজাত শিশুর [illegible]জন মাকে দেখলাম। এঁরা যে যেখানে কাজ করেন সেখান থেকে পুরো মাইনেয় ছাপ্পান্ন দিন ছুটি পাবেন। এখানে থাকবার কোনো খরচও তাঁদের দিতে হবে না।

বয়স অনুযায়ী এখানে শিশুদের তিনভাগে ভাগ করা হয়। জন্মের পর থেকে ন'মাস বয়স পর্যন্ত প্রথম বিভাগ; ন'মাস থেকে দেড়-বছর বয়স পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগ; দেড়-বছর থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত তৃতীয় বিভাগ।

এক জায়গায় সাড়ে-ছ'মাস বয়েসের একটি শিশুকে দেখলাম। দেখতে ঠিক এক বছরের মতো। একজন নার্স তাকে ব্যায়াম করতে শেখাচ্ছে। কতগুলো সাধারণ ডলাই-মলাই তো আছেই, তাছাড়া এক সময় দেখলাম নার্সটি শিশুর পা দুটো ধরে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে আর শিশুটি সোৎসাহে মাথা উঁচু করে আমাদের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে খুব সপ্রতিভভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এক জায়গায় দেখলাম ছোট-ছোট তক্তা, বেঞ্চ, চেয়ার, সিঁড়ি, রিং আর ডাণ্ডা নিয়ে আড়াই-বছরের শিশুরা নানারকমের কসরত দেখাচ্ছে আর খেলছে।

প্রশ্ন করে জানলাম শিশুদের কোনোরকম শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, এমন কি বকুনি পর্যন্ত দেওয়া হয় না। শুনে আরো অবাক হলাম, লেনিনগ্রাডে শিশুমৃত্যু বলে কোনো জিনিস নেই।

লেনিনের কর্মস্থলে

লাঞ্চের পর আমরা একদল গেলাম ঐতিহাসিক কর্মস্থল স্মল্‌নি দেখতে।

রুশ বিপ্লবের সময় এখান থেকেই লেনিনের নির্দেশমতো বিপ্লবী কমিটি তাঁদের সমস্ত কাজ পরিচালনা করতেন। বিপ্লবের আগে এই বাড়িতে রাজপুরুষদের কন্যাদের লালনপালন করা হত এবং আদবকায়দা শেখানো হত।

স্মল্‌নিতে ঢুকতেই চোখে পড়ে ব্রড্‌স্কির আঁকা লেনিনের একটি বিখ্যাত ছবি। পঁচিশ অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর মজুর, কৃষক ও সৈনিকদের সমাবেশে লেনিন বক্তৃতা দিচ্ছেন।

যে ঘরে বসে লেনিন পার্টির কাজকর্ম করতেন, সেই ঘর ঠিক তেমনি করে রাখা আছে। একই ভাবে রয়েছে সেদিনের সেই টেবিল, টেবিল-আলো, টেলিফোন, কুশন-চেয়ার, দোয়াতদান। ঘরের এক পাশে কাঠের পার্টিশান দিয়ে খানিকটা জায়গা আড়াল-করা। সেখানে লেনিনের বিশ্রাম নেবার জন্যে থাকত শাদাসিধে লোহার একটি খাট; আসবাবপত্র বলতে একটি টিপয় আর একটি আলমারি।

প্রায় তিনশো-হাত-লম্বা একটি বারান্দা পার হয়ে আমরা গেলাম এ্যাসেম্‌ব্লি হল্‌-এ। সেখানে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেস বসেছিল। আজও লেনিনগ্রাডের পার্টির বৈঠক এই জায়গাতেই হয়। হল্‌-এর প্রবেশপথে দুপাশের দেয়ালে জ্বলজ্বল করছে ১৯১৭ সালের রাষ্ট্রবিধান। একটি ছবিতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রথম বিদ্যুৎ-সরবরাহ-কেন্দ্রের পটভূমিতে লেনিনকে দেখা যাচ্ছে। লেনিনের জীবনের রক্ষণীয় বহু স্মারকচিহ্ন, দলিলপত্র এই স্মল্‌নিতে সযত্নে রাখা হয়েছে।

মেয়র-এর ভোজসভায়

১০.৯.৫৪। সকালে হোটেলের একটি বিশেষ ভোজনকক্ষে লেনিনগ্রাডের মেয়র আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। লেনিনগ্রাডের নানা কর্মক্ষেত্রের

বিশিষ্ট মেয়ে-পুরুষরা ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। অনেক বক্তৃতা এবং সেই সঙ্গে টোস্ট প্রস্তাবিত হল। ওদেশের শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়ে আরো অনেকের মতো আমাকেও কিছু বলতে হল।

সোভিয়েটের বিখ্যাত অভিনেতা চেরখাসভ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 'ঘোষ পরিবার' বলে আমাদের বাড়ির কথা উল্লেখ করলেন। ১৯৫০ সালে তিনি যখন পুদভকিন-এর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং ঘটনাচক্রে বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র গান শোনবার সুযোগ ঘটে।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী চন্দ্রশেখরণ লেলিনগ্রাডের মেয়রকে কিছু উপহার দিলেন, মেয়রও তার প্রতিদানে তাঁকে তাঁর ছেলের জন্যে খুব সুন্দর-সুন্দর খেলনা উপহার দিলেন।

আমার একপাশে ছিলেন ইউনিভার্সিটির রেক্টর অঙ্কশাস্ত্রবিদ আলেকজান্দ্রভ এবং অন্যপাশে ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যালে-নর্তকী। এই কদিনে যে কয়েকটি রুশ শব্দ রপ্ত করতে পেরেছিলাম তারই সাহায্যে ব্যালে-নর্তকীর সঙ্গে কোনোরকমে টেবিলী-ভদ্রতা রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। যখনই হোঁচট খাচ্ছিলাম আলেকজান্দ্রভ আমাকে তাড়াতাড়ি ঠিক-ঠিক শব্দটি যুগিয়ে দিচ্ছিলেন। কথায়-কথায় আলেকজান্দ্রভ অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের সুপ্রাচীন বিরাট ঐতিহ্যের কথা বললেন।

লাঞ্চ শেষ হতে বেশ বেলা হল। দুপুর নাগাদ আমরা জনকয়েক মিলে গেলাম নেক্রোপলিস-এ—কয়েকজন বড়-বড় লোকের সমাধি দেখতে। ভারি সুন্দর-সুন্দর সব পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ আর মূর্তি। যেসব বিখ্যাত লোকের সমাধি দেখলাম, তাঁরা কেউ লেখক, কেউ শিল্পী, কেউ বৈজ্ঞানিক। ডস্টয়ভস্কি, রিমস্কি করসাকভ (যাঁর অপেরা 'শেহেরজাদ' আমরা দেখেছি), গ্লিংকা (যাঁর অপেরা 'ইভান সুশান' আমরা দেখেছি), চেইকভস্কি (বিখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা, যাঁর 'সোয়ান লেক,' 'ইয়োলাণ্টা' আমরা দেখেছি), রুবেনস্টাইন—এ'দের প্রত্যেকেরই সমাধি আমরা দেখলাম।

আজ রাত্রেও আমাদের জলসা বেশ জমল। টেলিভিশনে প্রচার হওয়ায় দূরের লোকও দেখতে পেল।

কিষেণ মহারাজ আর আমি আজ ডুয়েট তবলা বাজালাম। রবিশঙ্কর

মাঝখানে বসে তাল দিতে লাগলেন। পুরো ব্যাপারটা ছ-সাত মিনিটের মধ্যে সারতে হল। কিষেণ মহারাজ যখন বোল তোলেন আমি ঠেকা দিই, আমি যখন বোল বাজাই কিষেণ মহারাজ ঠেকা দেন।

বরাবর যেমন হয়, উৎসাহী দর্শকদের ভিড় ঠেলে বাসে গিয়ে উঠতে হল। কিন্তু লেনিনগ্রাডের মতো ঠান্ডায় এত রাত্রে এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যে থিয়েটারের বাইরে আমাদের দেখবার জন্যে এত লোক ভিড় করে দাঁড়াবে ভাবতেই পারিনি।

বাসে বসে আছি। কাঁচের জানলায় টোকা পড়তেই চেয়ে দেখি আলেকজান্দ্রভ। বিদায় নিয়ে যাবার সময় জানালেন আমাদের জলসা দেখে তিনি মুগ্ধ।

এ পর্যন্ত যা আমাকে করতে হয়নি, আজ থিয়েটার থেকে বেরিয়ে বাসে বসে আমাকে তাই করতে হল। জন পঞ্চাশেক দর্শক ছেঁকে ধরলেন তাঁদের প্রোগ্রাম-এর উপর অটোগ্রাফ দিতে হবে। আমার জানলার কাছে রীতিমতো হুড়োহুড়ি লেগে গেল। কেউ-কেউ দেবনাগরী হরফে লিখে দেবার অনুরোধ করলেন। আমাদের সম্বন্ধে বিদেশীদের এই উৎসাহে ভারতবাসী হিসেবে মনে-মনে গর্ব অনুভব করলাম। মনে পড়ল, কিষেণ মহারাজকে আজ সকালেই একজন রুশ ছেলে তার বাবার লেখা একটি বই উপহার দিয়েছে—রুশভাষায় রামায়ণের অনুবাদ। বইতে সে নিজের হাতে বিশুদ্ধ হিন্দীতে একটি উপহারনামা লিখেছে।

লেনিনগ্রাডে শেষদিন

১১.৯.৫৪। সকালবেলায় চা-পর্ব সেরে প্রথমে নিকোলাস ক্যাথিড্রাল তারপর রুশ ক্যাথলিকদের জাতীয় খৃষ্টান চার্চ দেখতে গেলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য।

ক্যাথিড্রালের ভিতরে অপূর্ব কাঠের কাজ। এর তত্ত্বাবধান করেন সরকার। এখনো এখানে রোজ ধর্মানুষ্ঠান হয়। হল্-এর মধ্যে পনেরো হাজার লোক ধরে। দেয়ালের গায়ে প্রাচীন ধর্মপ্রাণ সাধকদের অনেক সব পুরোনো ছবি। পাছে বিকৃত হয়ে যায় সেইজন্যে আইকন কিম্বা ছবি-গুলোর উপর কোনোরকম মেরামতি কাজ সরকার অনুমোদন করেন না।

ইতালীয় পদ্ধতিতে আঁকা প্রায় দুশো বছর আগেকার দুটি অপূর্ব

ছবি দেখলাম। দেখে মনে হয় যেন এক্ষুনি আঁকা হয়েছে—রঙ এখনো এমন তাজা।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে গেলাম ব্যালে স্কুল দেখতে। একেবারে ছেলেবয়স থেকে কি ভাবে নাচ শেখানোর সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটাও গড়ে তোলা হয় ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।

যেমন তাদের স্বাস্থ্য, তেমনি মুখশ্রী। সপ্রতিভ শিশুর দল ছুটতে-ছুটতে এসে আলাপ করল। ফোটা ফুলের মতো মুখে তাদের হাসি লেগে আছে। কোথাও এতটুকু লোক-দেখানো ভাব নেই।

ন-বছর ধরে এই কেন্দ্রে শিক্ষা নিতে হয়। এক জায়গায় দেখলাম আট-দশ বছরের বারোজন মেয়ে পিয়ানোর সঙ্গে তাল রেখে পায়ের আর হাতের কতকগুলো ব্যায়াম করছে। এরা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ষষ্ঠ শ্রেণীর বারো-চোদ্দ বছরের ছটি মেয়ের নাচের পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেল। দশম এবং শেষ শ্রেণীর পাঁচজন ছাত্র এবং পাঁচজন আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্রী (বয়স ষোলো হবে) নাচে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাল। যারা বয়েসে নেহাত ছোট, তাদেরও কয়েকরকমের নৃত্যপরিকল্পনা আমাদের দেখানো হল।

সব শেষে ব্যালে স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ধরে বসল আমাদের পক্ষ থেকেও কিছু হওয়া চাই। গোপীনাথ, বিজয়রাঘব আর তারা চৌধুরী তাঁদের নাচের কিছু-কিছু নমুনা দেখালেন। প্রত্যেকটি নাচের শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘন-ঘন করতালিতে ব্যালে স্কুল মুখর হয়ে উঠল।

তারপর কিয়েভ

১২.৯.৫৪। দুটো প্লেনে দু দলে ভাগ হয়ে সকাল নটায় আমরা লেনিন-গ্রাড থেকে রওয়ানা হয়ে সাড়ে-চার ঘণ্টার মধ্যেই কিয়েভ-এ পৌঁছে গেলাম।

আকাশ বেশির ভাগ সময় ছিল কুয়াশায় ঢাকা। কিয়েভ-এ পৌঁছুবার কিছু আগে থেকে নিচেটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। যেন একটা প্রকাণ্ড সবুজ মখমল কেউ বিছিয়ে রেখেছে। খুব উপর থেকে দেখলেও বোঝা যাচ্ছিল জমির উপর যা কিছু আছে সবই বেশ সাজানো-গোছানো, মাপ-জোখ-করা।

হোটেল থেকে গাড়ি করে বিকেলের দিকে বার হওয়া গেল শহর দেখতে। চমৎকার পরিপাটি শহর। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কোনোদিক থেকেই মস্কো-লেনিনগ্রাডের চেয়ে কিয়েভ খাটো তো নয়ই, বরং এখানকার মেয়ে-পুরুষদের চেহারায় আর এ অঞ্চলের মাটিতে সরসতা আর সজীবতা একটু বেশি বলেই মনে হল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই উজ্জ্বল স্বাস্থ্য।

লতাপাতায় ফুলে পল্লবে শহরটাকে, বিশেষ করে চৌমাথাগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলায় অপেরা। বিরাট শরীর নিয়ে বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ড্যাঙ্কোভিচ আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আজকের অপেরার সঙ্গীত তাঁরই সৃষ্টি। সঙ্গীত আর অপেরা বল্‌শই-এর মতোই ভালো লাগল। বিশেষ করে সঙ্গীতাংশ।

নিয়ম আর পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলন করলে কণ্ঠে কী পরিমাণ গভীরতা, তেজস্বিতা আর স্পষ্টতা আসে, এখানকার প্রত্যেক গায়ক-গায়িকা তার মূর্ত প্রমাণ। মাইক্রোফোনের ব্যবহার বোধহয় শুধু বেতারেই হয়। বেতার ছাড়া কোনো গানের আসরে এঁদের মাইক্রোফোনের আশ্রয় নিতে দেখিনি। তবে মাইক্রোফোন না থাকলেও এঁরা যেখানে গান করেন সেখানে শব্দ-সঞ্চরণের নিখুঁত ব্যবস্থা। আর সেই সঙ্গে থাকে সহস্র-সহস্র শ্রোতার আগ্রহ-আকুল স্তব্ধতা।

প্রত্যেক অঙ্ক শুরু হবার আগে আমাদের একটি বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ড্যাঙ্কোভিচ আজকের অপেরাটির মর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। নাচ, গান, আর অভিনয় এদেশে সত্যিই খুব উঁচুদরের। বেশির ভাগ অপেরার উদ্দেশ্যই অবশ্য দেশাত্মবোধ জাগানো।

থিয়েটার থেকে আমাদের হোটেল 'ইনটুরিস্ট' খুব কাছে। আমরা হেঁটেই ফিরলাম।

১৩.৯.৫৪। সকালে ন্যাশনাল অপেরা থিয়েটারে রিহার্সাল সেরে দুপুরে গেলাম পুষ্প-প্রদর্শনী দেখতে। ঠিক রাস্তার কোল থেকেই চারদিক খোলা জমি ধাপে-ধাপে উঠে গেছে, তার উপর থাকে-থাকে ফুলের কেয়ারি। ফুল যে শুধু টবে আছে তা নয়, কিয়েভ-এর এক-একটি

জেলার জন্যে বরাদ্দ-করা এক-একটি জমিতেও নানারকম কায়দায় ফুল ফোটানো হয়েছে। জেলায়-জেলায় চলেছে প্রতিযোগিতা।

প্রদর্শনী থেকে গেলাম পেচিয়ারস্কি মঠ দেখতে। মঠের গায়ে একাদশ শতাব্দীর একটি ভাঙা ক্যাথিড্রাল। গত যুদ্ধের সময় জার্মানরা ভেঙেছে। রুশদেশের সঙ্গে তিনশো বছরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্মারক হিসেবে এখন সেখানে ইউক্রেন-এর শিল্পকলার মিউজিয়াম হয়েছে। নানারকম কাঠখোদাইয়ের কারুকার্য দেখলাম। একটি বিরাট গালিচার উপর চমৎকার রঙচঙে ছবি। গ্রামের লোকেদের সূচীশিল্প, রঙিন কাপড়ের টুকরো জোড়া দেওয়া ছবি, শাদা-মাটির বাসন, ফুলদানি, বাসনের উপর রঙের কাজ—সব কিছুর মধ্যেই পাকা হাতের ছাপ।

এ সমস্ত দেখবার পর আমরা গেলাম তোরণ-গির্জাঘর দেখতে। গির্জাটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরি। দেয়ালের গায়ে চারদিকে প্রাচীন যুগের মূর্তি। এই সব প্রতিষ্ঠানে অনেক সাধু থাকতেন যাঁরা বাইরের শত্রুর আক্রমণের সময় দরকার হলে অস্ত্রধারণও করতেন। উপরের সিলিঙ-এ কিছুটা পরের যুগের ফ্রেস্কো আছে। রঙ ম্লান হয়ে এসেছে। কাষ্ঠাসনের সারিগুলো সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর। সব ছবিরই বিষয়-বস্তু প্রাচীন। শুধু একটি ছবিতে চিত্রিত আধুনিক একটি ঘটনা—ইউ-ক্রেনবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার দৃশ্য।

অভিনব ফিল্মচিত্র

রাত্রে এখানকার একটি ফিল্মস্টুডিওর প্রোজেকশন ঘরে কয়েকটি ছবি দেখানো হল। তার মধ্যে ছিল আমাদের প্রতিনিধিদলের কিয়েভ-এ প্রথম অবতরণের সংবাদচিত্র।

ইউক্রেন-এর সঙ্গে রুশিয়ার তিনশো বছরের যোগসূত্রের স্মরণে সম্প্রতি একটি নৃত্যগীতের উৎসব হয়েছিল, তার অনেক রঙিন ছবি দেখানো হল।

ছবির টেকনিকটি বড় সুন্দর। স্টেজের দৃশ্য দিয়ে শুরু করে ছবি আউটডোরে চলে যাচ্ছিল, আবার স্টেজে এসেই দর্শকদের মুহুর্মুহুঃ করতালির মধ্যে দৃশ্য সমাপ্ত হচ্ছিল। বেশির ভাগই লোকগীত আর লোকনৃত্য। কয়েকটির কম্পোজিশন খুবই সুন্দর; একটি তো অতুলনীয়।

লেনিনগ্রাডে থাকতে তুলিতে আঁকা একটি বিরাট আকারের বিখ্যাত মূল ছবি দেখেছিলাম : 'সুলতানকে লেখা চিঠি।' পরে নানা জায়গায় তার নানা আকারের প্রতিকৃতি দেখেছি। বিজয়-অভিলাষী সুলতানকে বিভিন্ন জনপদের স্বাধীনচেতা নেতারা ব্যঙ্গরসে পূর্ণ একটি দীর্ঘ চিঠিতে তাদের দৃঢ় প্রতিরোধের মনোভাব জানিয়েছে। চিঠিটা যখন পড়া হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটেছে। এই হল ছবিটির বিষয়।

কিয়েভ-এর ফিল্মস্টুডিওর পর্দায় এই স্থির ছবিটাকে দেখাবার কী অর্থ গোড়ায় আমরা বুঝতেই পারিনি। খানিকক্ষণ পর আমরা তো অবাক—ছবির চরিত্রগুলো হঠাৎ জীবন্ত হয়ে নাচতে শুরু করে দিয়েছে!

ছোটদের মধ্যে

১৪.৯.৫৪। দল বেঁধে আমরা গেলাম একটি কিন্ডারগার্টেন দেখতে। দুশো শিশুর সেখানে শিক্ষা আর লালনপালনের ব্যবস্থা। খোলা আকাশের নিচে বাগান। তার মধ্যে একদল ছ-সাত বছরের ছেলে-মেয়ে কালো শর্ট পরে খালি গায়ে ছুটোছুটি করছে। সবাই শ্রমিকের সন্তান, দেখতে বেশির ভাগই রাজপুত্তুর রাজকন্যার মতো।

আমরা সবাই ছুটে গিয়ে যে যেটাকে পারলাম ঘাড়ে-পিঠে তুলে নিলাম। বিদেশী আগন্তুকদের এই আদরের অত্যাচারে কেউ বড় একটা প্রতিবাদ জানাল না।

এইরকম কিন্ডারগার্টেন এ-পল্লীতে আরো আটত্রিশটি আছে। শিশুরা রোজ বারো ঘণ্টা এখানে কাটায়। তাদের চলাফেরা, স্নান, খেলা, খাওয়া, ঘুমনো, শিক্ষা সব কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে যথানিয়মে করতে হয়। দেখাশোনা যাঁরা করেন তাঁরা সবাই এ-কাজে সিদ্ধহস্ত। যেগুলো নইলে নয়, সেইসব ব্যাপারেই বাঁধাবাঁধি—বাকি সব ব্যাপারে শিশুদের অখন্ড স্বাধীনতা।

যেতেই আমাদের চোখে পড়ল বাগানের মধ্যে প্রকান্ড একটা খেলার জাহাজ। আর একপাশে একটি নৌকো আর একটা বাস। এর মধ্যে ঢুকে বাচ্চারা মনের সুখে হৈ-হুল্লোড় করতে পারে। একটা ঘেরা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা হরিণ।

প্রত্যেকের জিনিসপত্র রাখার জন্যে আলাদা-আলাদা আলমারি। যার যেটা দরকার নিজেই বার করবে আবার দরকার মিটে গেলে তুলে রাখবে। যাদের বয়স খুবই কম, এখনো হাতেখড়ি হয়নি—তাদের আলমারিতে কোনো নাম লেখা থাকে না; সে জায়গায় জন্তুজানোয়ার, ফুলফল, লতা-পাতা আঁকা থাকে। ঐসব চিহ্ন দেখে তারা যে যার আলমারি চিনে নেয়। দেখলাম খাবার ঘরে ছোট্ট টেবিলে বসে সাড়ে-তিন বছরের শিশুরা দিব্যি নিজেরা-নিজেরা খাচ্ছে।

একটা বড় হল্‌ঘরে দেখলাম পিয়ানোর তালে-তালে একদল শিশু নানারকমের কুচকাওয়াজ করছে আর কসরত দেখাচ্ছে। কোরাসের গানের সময় তারা চটপট ছোট-ছোট চেয়ার জুটিয়ে এনে যে যার জায়গায় বসে পড়ল, আবার খেলা আর নাচ শুরু হবার ঠিক আগে নিজেরাই নিজেদের চেয়ার সরিয়ে রেখে দিয়ে এল। একবারও তাদের বলতে হল না।

নাচের সময় বাচ্চারা মস্তানা, রবিশঙ্কর, পট্টবর্ধনজী, মীরা আর সুরেন্দর কাউরকে হাত ধরে টানতে-টানতে নাচের জায়গায় নিয়ে গেল। ছোটয় বড়য় সবাই যখন হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে দিল সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

সেখান থেকে গেলাম ক্রেশে দেখতে।

শ্রমিক মায়েরা কাজ করতে যাবার সময় তাঁদের দু মাস থেকে তিন বছর বয়সের বাচ্চাদের ক্রেশেতে রেখে যান। তাদের খেলাধুলো, আহার-নিদ্রা এখানেই হয়। চমৎকার ব্যবস্থা। কোনো গোলমাল নেই, চ্যাঁ-ভ্যাঁ নেই। বাচ্চারা হয় খুশি মনে খেলে বেড়াচ্ছে, নয়তো খেয়েদেয়ে নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। পনেরোশো রুবল-এর বেশি যারা মাইনে পায়, তাদের বাচ্চাদের জন্যে একশো রুবল চাঁদা দিতে হয়।

লেনিন-মিউজিয়াম

হোটেলে সকালের চা-জলখাবার সেরে পায়ে হেঁটেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম লেনিন-মিউজিয়াম দেখতে। জায়গাটা কাছেই।

সত্যিই দেখবার মতো। ঢুকতেই সামনে পড়ে লেনিনের একটি বিরাট মূর্তি। তার নিচে একটি ফলকের উপর খোদাই করা স্তালিনের স্বহস্ত-লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতিলিপি। ১৯৩৮ সালে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত।

এত রকমের ছবি, মূর্তি, ঐতিহাসিক দলিল আর স্মারকচিহ্ন সাজানো আছে যে একবার ঘুরলে লেনিনের জীবন মোটামুটি জানা হয়ে যায়।

ন-বছর বয়েসের লেনিনকে সপরিবারে দেখা গেল একটি ফোটোতে। চার বছর বয়েসে লেখাপড়ায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। চোদ্দ বছর বয়সে পাওয়া তাঁর স্কুল সার্টিফিকেট এবং পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পাওয়া সরকারী মেডেলটি দেখলাম। তাঁর শিক্ষা বলকান বিশ্ববিদ্যালয়ে; কিন্তু থিসিস লিখে পাঠিয়ে তিনি গ্রাজুয়েট হন পীট্‌স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আইনও পড়েছিলেন, কিন্তু আইনজীবী না হয়ে তিনি মার্ক্সবাদের টানে বিপ্লবের কাজে জীবন উৎসর্গ করলেন। তেইশ বছর বয়সে তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন শ্রমিকদের দল গড়তে।

প্রথম যে কারাগারে তিনি বন্দী হন, মিউজিয়ামে তার একটি চমৎকার মডেল আছে। ১৯০০ সালে লেনিন 'ইস্‌ক্রা' পত্রিকা বার করেন, তার একটা কপি দেখলাম।

একটা মডেল দেখলাম। জমির উপর একটা বাড়ি। তার বেশ খানিকটা দূরে শুকনো একটা কুয়ো। কুয়োর নিচে একটা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বাড়িটার তলায় একটা প্রকাণ্ড ঘরে যাওয়া যায়। লুকোনো ঘরের মধ্যে বিপ্লবীদের কাগজপত্র ছাপবার যন্ত্র।

১৯০৫ সালে মস্কোতে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়, তা দেখানো হয়েছে একটি প্রকাণ্ড বিদ্যুৎচালিত মানচিত্রে। যেখানে যে ঘটনা ঘটেছে আনুপূর্বিক ভাবে তা ফোটোগ্রাফ সহযোগে দেখানো হয়েছে।

এক জায়গায় দেখলাম প্রথম প্রকাশিত 'প্রাভদা'র একটি কপি। লেনিনের লেখা একটি প্রবন্ধে রয়েছে এশিয়ায় গণজাগরণের উল্লেখ। লেনিনকে পাঁচবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। ১৯১৭ সালে পিটার্স-বুর্গে তিনি ফিরে আসতে সমর্থ হন। একটি ফোটোগ্রাফে লেনিনের ছদ্মবেশধারী চেহারা ও বেনামী পাসপোর্ট। ১৯১৭ সালের ১০ই অকটোবরে লেনিনের নিজের হাতে লেখা সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক। একটি ছবিতে গুলিতে আহত লেনিন।

১৯২০ সালের ২০শে মে তারিখের একটি ছবি। ভারতীয় বিপ্লবী-দের তিনি সমর্থন জানাচ্ছেন এবং বলছেন এশিয়া স্বাধীন হোক।

একটি প্রকাণ্ড গোলকে পৃথিবীর মানচিত্র। তাতে দেখানো হয়েছে

পাঁচশো-এগারো জায়গায় লেনিনের রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১৭ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত লেনিন যেসব পোশাকে পরতেন, একটি কাঁচের আলমারিতে তা সাজানো আছে।

একটি মর্মস্পর্শী ছবি। লেনিনের মৃত্যুশয্যায় দেখা করতে এসেছেন স্তালিন। মৃত্যুর আগে লেনিন লিখেছেন, এশিয়ার মুক্তির জন্যে রুশিয়া, চীন ও ভারতের একতা একান্ত দরকার।

শেষ হল্‌টা এমনিতেই থমথমে গম্ভীর। লেনিনের অন্তিম জীবনের অনেক ছবি ও নিদর্শন। লেনিনের মৃত্যুতে ইরাণ বার্লিন প্রাগ এবং আরো বহুদেশে গভীর শোকপ্রকাশের দৃশ্য। একটি ছবিতে স্তালিন লেনিনের শিক্ষাবলী পালন করতে অঙ্গীকার করছেন।

মিউজিয়ামে এ ছাড়াও আছে লেনিন ও স্তালিনের আরও অজস্র ছবি, মূর্তি, নানারকমের খোদাই ও সূচীকাজ।

আজ ছিল আমাদের দ্বিতীয় এবং শেষ আসর। স্টেজের ভিতরে টেলিভিশান সেট থাকায় এতদিনে নিজেদের অনুষ্ঠানগুলো ভালো করে দেখবার একটা মওকা পাওয়া গেল। মনে হল আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটাই সব থেকে বেশি উতরেছে।

নদিয়া সিং আর বাবু সিং-এর মৃদঙ্গ বাজাতে-বাজাতে নানারকমের কসরত আর কৌশল দেখানো মণিপুরী নাচটি যে কত মনোজ্ঞ এবং স্টেজ-উপযোগী, আজ টেলিভিশানে দেখার পর ভালো করে বুঝলাম। দুজন মৃদঙ্গী-নর্তকের নাচ, অঙ্গসঞ্চালন, হাবভাব, দূরে সরে যাওয়া, কাছে আসা—সব কিছুর মধ্যে এমন একটা সৌসাদৃশ্য আছে যা দেখে ভালো লাগে আবার হাসিও পায়। আমাদের নাচগানগুলো বড় বেশি ভারিক্কি। তাই মাঝে-মাঝে এই ধরনের মজাদার নাচ খুবই উপভোগ্য হয়।

কিয়েভ-এ শেষদিন

১৬.৯.৫৪। নীপার নদীর স্টিমারঘাটে একটি শাদা ধবধবে ছোট্ট স্টিমার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। জলবিহারে আমরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলাম ডেপুটি মিনিস্টার অব কালচার, অপেরার কয়েকজন বিখ্যাত গায়িকা এবং বিপুলকায় কম্পোজার ড্যাঙ্কোভিচ্‌-কে।

আজকের সকালটা ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে হওয়া সত্ত্বেও খুব ভালো

লাগছিল বেড়াতে। জায়গায়-জায়গায় নীপার খুবই চওড়া। পূর্ববাঙলার নদীর কথা মনে করিয়ে দেয়। জল ঘোলাও নয়, আবার কাঁচের মতো স্বচ্ছও নয়। কেমন যেন নিষ্প্রভ মলিন।

মাঝে এক জায়গায় স্টিমার থামিয়ে আমরা ডাঙায় উঠলাম। খোলা মাঠে ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে খুব খানিকটা হেঁটে আর ছুটোছুটি করা গেল। সেই সঙ্গে মাঝে-মাঝে কিছু হাল্কা খাবার আর চা-কফি।

স্টিমারে পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করেই কাটল। হেনরিয়েটা রুশ ভাষায় বেশ কিছু জাতীয় সঙ্গীত আর লোকসঙ্গীত গেয়ে শোনাল—শোনাবার আগ্রহে নয়, মনের আনন্দে।

কথাপ্রসঙ্গে হেনরিয়েটার কাছে সোভিয়েটের আয়কর সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য জেনে নিলাম। যারা নিঃসন্তান এদেশে তাদের আয়কর দিতে হয় শতকরা ছয় ভাগ। যাদের দুটি সন্তান তাদের আয়কর শতকরা দু ভাগ। কিন্তু দুটির বেশি যাদের সন্তান তাদের কোনো আয়কর দিতে হয় না। কর আছে দু রকমের—আয়কর আর সংস্কৃতি-কর। বিকলাঙ্গদের আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

হোটেলে ফিরে এসেই লাঞ্চ। ডেপুটি মিনিস্টার উপস্থিত। দু পক্ষ থেকেই টোস্টের পর টোস্ট আর পরস্পরের গুণকীর্তন। কিয়েভ থেকে আমাদের প্রত্যেকের একটি করে সরকারী উপহার মিলল—পুরুষদের ইউক্রেনী সার্ট আর মেয়েদের ব্লাউজ।

হাতখরচা বলে আমাদের যা দেওয়া হয়েছিল তাই দিয়ে আমরা অনেকেই কিয়েভ থেকে কিছু-কিছু জিনিসপত্র কিনলাম। বাষট্টি রুবল দিয়ে পাওয়া গেল একটা কাঠের ঈগল। দেশে ফিরে বন্ধুদের উপহার দেবার জন্যে আমি আর রবিশঙ্কর কাঠের-কাজ-করা গুচ্ছের কলম আর সিগারেট হোল্ডার কিনলাম।

সন্ধ্যে সাতটায় বাগানঘেরা এক বড় হোটেলে কালচারাল মিনিস্টারের পার্টি। হোটেলের দরজায় পেঁছুতে কম সিঁড়ি ভাঙতে হল না। ডাইনিং হল্-এ ঢুকতেই উপরের অলিন্দ থেকে সম্বর্ধনা জানিয়ে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। যন্ত্রের মধ্যে ছিল পিয়ানো, এ্যাকর্ডিয়ান, ট্রামপেট, ক্ল্যারিওনেট, জ্যাজ্ সেট আর বেহালা। যেমন সাধারণ হোটেলে বাজে। একটু যেন বেশি সার্কাসের ভাব। নানান দেশের সুর। খানিকটা ভারতীয় ধরনের

সুর বাজল। শিল্পীদের মধ্যে রবিশঙ্কর কিছু বললেন। কিয়েভ-এর মেয়েদের সৌন্দর্যের তিনি প্রশংসা করলেন। কিয়েভ-এর মেয়ে ডেপুটি মেয়র তার জবাব দিতে উঠে ভারতীয় পুরুষদের চেহারার সুখ্যাতি করলেন। আমাদের দেখা বাগদানামিনস্কি অপেরার অনেক গায়ক-গায়িকা তাঁদের অপূর্ব ওজস্বী কণ্ঠের গান শোনালেন।

পট্টবর্ধনজীও ছাড়বার পাত্র নন। ইউরোপীয় সঙ্গীতের উপর এক হাত নেবার জন্যে নিজের চড়া গলা আরো কয়েক কাঠি চড়িয়ে তিনি একটি ভজন ধরলেন। ভারতীয় গায়করা যে চীৎকারেও পরাঙ্মুখ নন, কিয়েভ-এর বড়-বড় গায়ক-গায়িকারা সেদিন তা ভালোভাবেই টের পেলেন।

কিয়েভ-এর বিশিষ্ট নাগরিকেরা যখন টোস্ট করবার সময় কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবিশিল্পীদের নাম এবং রচনা উল্লেখ করে সম্মান জানাচ্ছিলেন—শুনে ভারি গর্ব বোধ হচ্ছিল। কিয়েভবাসীদের অন্তরঙ্গ ভদ্র ব্যবহারে দলের সবাই মুগ্ধ হলেন। চেহারার দিক থেকে যেমন তাঁরা সুদর্শন, স্বভাবের দিক থেকেও তেমনি নম্র।

আকাশপথে সোচি

১৭.৯.৫৪। কিয়েভ থেকে সোচি—আকাশপথে ঘণ্টা পাঁচেকের রাস্তা। রাত্রেই আমরা বাঁধাছাঁদা শেষ করে রেখে ছিলাম। বেলা বারোটা নাগাদ আমরা সোচিতে পেঁছুলাম।

আজকের হাওয়াই সফরটা উপভোগ করবার মতো। বিশেষ করে শেষের এক ঘণ্টা। নিচে তরঙ্গ-উত্তাল কৃষ্ণসাগর, বাঁদিকে ককেশাস পর্বত-মালার গায়ে-গায়ে ঘনসম্বদ্ধ গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সুন্দর-সুন্দর নক্সার প্রাসাদ আর নিখুঁত ছবির মতো রকমারি ইমারত। এদিকে সমুদ্র, ওদিকে পাহাড়। তার মধ্যে কয়েক বর্গ মাইল জুড়ে সোচির লোকালয়।

প্লেন থেকে নেমে পাহাড়ের উপর দিয়ে মোটরে এক ঘণ্টার রাস্তা। দুপাশের গাছপালা সাজানো বাগানের মতো। আঁকাবাঁকা পথে যেতে-যেতে পাতার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ উঁকি দেয় নীল সমুদ্র।

সোচি হল সোভিয়েটের শ্রমিককর্মীদের স্বাস্থ্য ফেরাবার জায়গা। এখানে অনেকগুলো স্বাস্থ্যাবাস আছে। বছরে পুরো মাইনেয় আঠাশটা ছুটির দিন তারা এখানে এসে কাটাতে পারে। থাকবার খরচ বহন করবে

যে যার ইউনিয়ন। প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যাবাসে আধুনিকতম চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, পথঘাট, ঘরবাড়ি সবই সুন্দর। বাইরের প্রকৃতি আর মানুষের পরিকল্পনা যেন এখানে পরস্পরে বন্ধুর মতো হাত মিলিয়েছে।

হোটেলের একই কামরায় আমি আর রবিশঙ্কর দুপুরে জানলা দিয়ে আসা সমুদ্রের ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ হের্নরিয়েটা এসে আমাদের তাড়া দিয়ে ওঠাল। আমাদের ফেলে রেখে গোটা দশেক মোটরবোট নিয়ে দলের আর সবাই সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছে। বিজয়রাঘবেরও আমাদেরই মতো দশা।

আমরা চারজনে একটা ছোট মোটরে চেপে খানিকটা দূরে নৌকোঘাটে গিয়ে নামলাম। সেখানে যেন মোটরবোর্ট-এর মেলা—মোটর গাড়ির মতো দেখতে ছোট-ছোট অসংখ্য বোট জলে ভাসছে। তারই একটাতে আমরা উঠে বসলাম।

মোটরবোট ছুটল না তো, যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। সামনে থেকে ঢেউ এলে নৌকাটা শূন্যে তুড়িলাফ দেয়। একবার জলে, একবার শূন্যে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে। এর আগে আকাশ থেকে যেসব দৃশ্য দেখেছি জলের উপর থেকে আবার তা দেখতে-দেখতে চললাম। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে সাইপ্রাস এবং নাম-না-জানা আরো সব গাছের ঘন ঝাড়; পাহাড়ের থাকে-থাকে অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকা। কোথাও দুটো পাহাড় জোড়া দেওয়া ঝোলানো পুল; কোথাও গোলঘর, কোথাও চূড়োওয়ালা ইমারত। যেতে-যেতে দেখা গেল সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে হুসহুস করে ছুটেছে ট্রেন। ঘাটে নেমে স্নান করছে একদল লোক। কেউ-কেউ স্নানের পোশাকে একা-একা নৌকা বাইছে।

বেড়ানো শেষ করে যেখানে বোটে উঠেছিলাম সেখানেই ফিরে এলাম।

পুরো দলটাকে আমরা পেয়ে গেলাম একটি বাগানে। গোলাপের গন্ধ ভুরভুর করছে। চারদিকে ফুল আর পাতার মেলা। তার মধ্যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা কেউ ভলিবল খেলছে, কেউ খেলছে টেনিস। তাদের চোখে-মুখে প্রাণের কী প্রাচুর্য!

তারপর আলোয় আলো রাত্তির।

নারায়ণস্বামী, ডোরাই, বিজয়রাঘব আর আমি হের্নরিয়েটাকে নিয়ে

সিঁড়ি আর রাস্তার ধাপ পার হয়ে একেবারে সমুদ্রের কিনার পর্যন্ত বেড়িয়ে এলাম।

খনিশ্রমিকদের স্বাস্থ্যাবাসে

১৮.৯.৫৪। সকালের দিকে একটা খোলা বাসে করে আমরা গেলাম খনিশ্রমিকদের স্বাস্থ্যাবাস দেখতে।

স্বাস্থ্যাবাসটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে আট কোটি রুবল। চার হাজার শ্রমিক এখানে বছরে আঠাশ দিন করে থাকতে পারে। থাকতে যা খরচ হয় তার শতকরা ত্রিশভাগ নিজেদের দিতে হয়, বাকি সত্তর ভাগ বহন করে খনিশ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন। এটা হাসপাতাল নয়, স্বাস্থ্যাবাস। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে এখানকার ল্যাবরেটরি ঠাসা। এক্স-রে আর থেরাপির যন্ত্রপাতি ছাড়াও স্নায়ুচিকিৎসার জন্যে বিভিন্ন কেবিনে আছে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব যন্ত্র। নানারকম রোগ সারাবার জন্যে আছে কাঁচের ঘরে রকমারি স্নানের ব্যবস্থা। দাঁত, চোখ, কান, গলার অসুখই হোক বা অন্য যে-কোনো রোগই হোক—চিকিৎসার কোনো ত্রুটি নেই। একটি হল্-এ দশটি বেড্ আছে—প্লাস্টারের সাহায্যে চিকিৎসার জন্যে। আটশো মাইল দূর থেকে এক বিশেষ ধরনের কাদা এনে প্লাস্টার তৈরি করা হয়।

এটা একটা স্যানাটোরিয়াম, কিন্তু এর যা স্থাপত্য, গৃহসজ্জা আর আসবাব, তাতে খনিশ্রমিকদের রাজপ্রাসাদ বললেই হয়। থাকবার ছোট-ছোট ঘর। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি পরিপাটি করে সাজানো। প্রকাণ্ড ডাইনিং হল্-এ একসঙ্গে সাড়ে-তিনশো লোকের খাবার মতো ব্যবস্থা। খোলা আকাশের নিচে থিয়েটারের বিরাট মঞ্চ। সিনেমাও দেখানো হয়। চারশো লোক বসে। স্নানের শান-বাঁধানো পুকুর, তাতে দেড়শো ফুট নিচের সমুদ্র থেকে পাম্প করে তোলা জল ভরা থাকে।

স্যানাটোরিয়াম থেকে সোজা সমুদ্রের ঘাটে যাবার রোপওয়ে। মোটা মজবুত লোহার তারে একটি বাস্ যখন ঝুলতে-ঝুলতে নামে, ঠিক তখনই আরেকটি বাস্ উপরে ওঠে। নামতে মিনিট আড়াই লাগে।

রাত্রে আমাদের আসর। বেলাবেলি আমরা থিয়েটারে রওয়ানা হলাম। বিরাট নতুন বাড়ি। দেখতে বল্শই-এর মতো।

শ্রোতাদের যে ভালো লেগেছে, তা বোঝা গেল জলসা ভাঙবার পর

বাইরে বেরোবার সময়। অভিনন্দন কুড়োতে-কুড়োতে ভিড় ঠেলে আমাদের বেরোতে হল। তবলাবাদক হিসেবে কোথাও এত বেশি লোক অভিনন্দন জানায়নি। পারকাশান যন্ত্রটি সম্পর্কেও অনেকেরই খুব আগ্রহ দেখলাম। হোটেলে ফিরে এসেও সিঁড়িতে, বারান্দায়, খেয়ে-দেয়ে বাগানে বেড়াবার সময় অনেকেই অযাচিতভাবে আমাদের কনসার্টের প্রশংসা করলেন। অন্য দেশের বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে এঁদের জানবার অদম্য উৎসাহ দেখে অবাক হতে হয়। তার মধ্যে এতটুকু হুজুগ নেই, কৃত্রিমতা নেই।

আজকের জলসা ভালো হওয়ায় সকলেরই মনমেজাজ ভালো ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর গভীর রাত্রে রবিশঙ্কর, মন্তানা, বিজয়রাঘব আর আমি হোটেলের সামনেই সমুদ্রের দিকে সিঁড়ি ভেঙে বেড়াতে বেরোলাম। যাবার পথে অনেকেই আমাদের চিনতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

দোভাষীরা বলে দিলেন যেন বেশি দূরে না যাই। রাত তখন একটা। বেশি ভিড় নেই। মাঝে-মাঝে একত্রে চার-পাঁচজন কিম্বা যুগলে লোক দেখা যায়। রাত্রে এভাবে বেড়ানোর বিরুদ্ধে আমাদের দলের নেত্রীর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তাঁর যে সমর্থন থাকবে না—এ আশঙ্কা আমাদের সকলেরই ছিল। কিন্তু নিয়ম মেনে-মেনে আমরা ক্লান্ত; তাই এমন সুন্দর রাত্রে আমরা ঠিকই করেছিলাম অবাধ্য হব। কিন্তু বেশি দূরে যেতে সাহস হল না। হোটেলে ফেরবার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। ঊর্ধ্বমুখী বাঁধানো রাস্তা; বাগানের মতো কেয়ারি-করা রাস্তা। হঠাৎ একটি বেঞ্চের দিকে নজর গেল। দোভাষী অল্গা, হেনরিয়েটা আর আলেক-জান্দ্রিয়া বসে আছে। পাছে আমরা পথ হারাই, তাই বোধহয় নজর রাখছিল। কিছুক্ষণ হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করে আমরা চারজনে হোটেলে ফিরে এলাম।

১৯.৯.৫৪। পাহাড়ের চূড়ায় উঠব বলে সকালে একটি ছাদখোলা মোটরে আমরা রওয়ানা হলাম। মাঝপথে ফুলের একটি প্রদর্শনী আর গন্ধক-স্নানভবন দেখলাম। এই স্নানভবনটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে এক কোটি রুবল। এটা তৈরি হয়েছে ১৯৩৮ সালে। বছরে কুড়ি লক্ষ লোক স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় এখানে স্নান করতে আসে।

এখানে নানারকম স্নানের ব্যবস্থা। সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতিও নানা ধরনের। এক জায়গায় মেন্থলের বাষ্প আঘ্রাণ করবার সরঞ্জাম। সারবাঁধা বসবার জায়গা। তার সামনে নল-লাগানো চোঙে নাক লাগিয়ে বাষ্প নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়তে হয় ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট। প্রত্যেক আসনের সামনে একটি করে বালির ঘড়ি। আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম এতে কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী এবং নাকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

তারপর উঠে গেলাম পাহাড়ের চূড়ায়। সুন্দর পাহাড়ী রাস্তা। আবহাওয়া ভারি স্নিগ্ধ। পেঁছুতে ঘণ্টাখানেক লাগল। পাহাড়ের চূড়ায় দুশো ছাব্বিশটি সিঁড়ির ধাপওয়ালা উঁচু একটি মিনার। তার উপর থেকে নিচে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

কাছেই একটা রেস্তরাঁয় মেয়র আমাদের ভোজ দিলেন। এই জনবিরল জায়গাতেও এরকম রেস্তরাঁ এবং এত আমন্ত্রিত লোক আমরা আশাই করিনি। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চলল পালা করে দু-দলের গান।

সোচিতে আজই আমাদের শেষদিন। এবার আমাদের যেতে হবে আর্মিনিয়ার প্রধান শহর এরেভানে। কাল সকাল আটটায় প্লেন ছাড়বে।

আর্মিনিয়ার শহরে

২০.৯.৫৪। সকাল আটটায় প্লেন ছাড়বার কথা ছিল। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় বিমানঘাঁটিতে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। দশটা পনেরো মিনিটে আমাদের নিয়ে দুখানা প্লেন পর-পর ছাড়ল।

সমুদ্র পার হয়ে ককেশাস পর্বতমালা। সামনে নিচে আকাশ ঘন কুয়াশায় ঢাকা। প্লেনে বসে-বসে অনেকগুলো চিঠি লিখলাম। বেশ শীত-শীত লাগছিল। নিঃশ্বাস নিতেও বেশ একটু চাপ বোধ হচ্ছিল। দরকার পড়লে গাওয়া যাবে বলে সোভিয়েট-ভারত মৈত্রী নিয়ে হিন্দীতে একটা গানও লিখে ফেললাম। এরেভানে পেঁছুতে তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লাগল। মাটিতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। লোকের ভিড় খুব। তেমনি গরম। এখানকার লোকদের চেহারাগুলো ভারি সুশ্রী।

বড় হোটেল। হোটেল ইনটুরিস্ট। লাঞ্চে দেশী রুটি আর পোলাও পেয়ে সবাই খুব খুশি।

তারপর শহর দেখতে বেরোলাম। একটি ছোটখাটো পাহাড়ের উপর

স্তালিনের একটি বিরাট খোদাই-করা মূর্তি। সেখান থেকে শহরের চারদিক বেশ চমৎকার দেখা যায়। দূরে মেঘের মতো দেখায় এরারাট পাহাড়ের আকাশ-ছোঁয়া চূড়া। তার ওপারে তুরস্ক।

আটশো বছর ধরে তুরস্কের পদানত থাকবার পর ১৮৩৮ সালে আর্মেনিয়া রুশিয়ার জারদের দখলে আসে। ১৯২০ সালে আর্মেনিয়া স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারপর থেকেই এখানকার চেহারা বদলে যায়। আগে এখানে শুধু মাটি কিম্বা পাথরের বাড়ি হত। ১৯২০ সালের পর আধুনিক ধরনের বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট তৈরি হয়। দূরে একটা ছোট টিলার উপর সরকারী ঋণের টাকায় গৃহস্থদের ছোট-ছোট বাড়ি উঠছে দেখলাম।

শহরের ভিতর দিয়ে গেছে খরস্রোতা হ্রাজদান নদী। সিভান হ্রদ থেকে উৎসারিত এই নদী থেকেই এ-অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। আর্মেনিয়াতে বৃষ্টিপাত খুব কম। সিভান হ্রদের জলও নাকি ক্রমে শুকিয়ে আসছে। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে তাতে বিদ্যুৎশক্তিতে টান পড়বার ভয় নেই।

নদীর ধার বরাবর তিনটি স্টেশন, ছোট দুটি রেলগাড়ি আর ইঞ্জিন, সুড়ঙ্গ, পুল—এই নিয়ে ছোটদের জন্যে আছে কম-দৌড়ের একটা রেল-পথ। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাই এখানকার যাবতীয় কাজ চালায়। তারাই স্টেশন-মাস্টার, তারাই গার্ড. তারাই ড্রাইভার। এক কথায়, এ-রেলপথে ছোটরাই হল সব কিছু।

রাত্তিরে প্রোজেকশান ঘরে কিছু-কিছু আর্মানী ছবি দেখানো হল। তাতে ছিল কুশলী আর্মানী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, কুচকাওয়াজ আর কসরতের আশ্চর্য পরিচয়। সব থেকে অবাক লাগল একটি মানুষের ফোয়ারা দেখে।

২১.৯.৫৪। সকালে রিহার্সালের পর ঘড়ির একটি কারখানা দেখতে যাওয়া গেল। বছর দুই হল কারখানাটা হয়েছে। দু হাজার শ্রমিকের মধ্যে বেশির ভাগই স্ত্রীলোক। এই কারখানায় রোজ চার হাজার পাঁচশো ক্লক তৈরি হয়। ইউক্রেন এবং বাইলো-রুশিয়া থেকে কাঁচা মাল আসে। দরকারী তিন হাজার মূল উপাদানের মধ্যে বেশির ভাগই আর্মেনিয়া

থেকে সংগ্রহ করা হয়। দু হাজারের বেশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এই কারখানাতেই উৎপন্ন হয়।

কারিগর তৈরির জন্যে এখানেই একটি স্কুল আছে। শ্রমিকদের শিশুদের জন্যে আছে ক্রেশে, কিণ্ডারগার্টেন, সব কিছু। হঠাৎ একটি হল্-এ ঢুকে একসঙ্গে তেইশ হাজার এ্যালর্ম ঘড়ির ঘণ্টা বাজতে শুনে আমাদের কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম হল।

লাঞ্চের পর গেলাম একটি আর্ট-গ্যালারি দেখতে। একটি ভাগে রুশ ছবি, একটি আর্মানী ছবি, আরেকটি ভাগে ইউরোপীয় ছবি। প্রাচ্যের ছবির জন্যে একটি নতুন বিভাগ তৈরি হচ্ছে। আর্মানী শিল্পীদের ছবি আঁকার একটা নিজস্ব ধারা আছে বোঝা গেল। বড়-বড় রুশ চিত্রকর ছাড়াও ভ্যানডাইক, রুবেন ও ফ্যাল্‌কন-এর ছবি দেখলাম। প্রাচ্যবিভাগে শিল্পদ্রব্য সরে আসতে শুরু করেছে। কিছু রেশমের কাজ আর একটি বুদ্ধমূর্তি দেখলাম।

এরেভান খুব ভালো লাগলেও কয়েকটি ব্যাপারে কিন্তু নিজেদের দেশের কথা মনে না পড়ে পারেনি। অপেরা হল্-এর পায়খানায় কমোডের বদলে পাদানীওয়ালা বসবার ব্যবস্থা। চায়ের চিনিতে আরশোলার গন্ধ। রাত্রের সাপারে কিসমিসওয়ালা কেক। আর শহরের মধ্যেই সুড়ঙ্গপথে যেখানে-সেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার দুর্গন্ধ।

২২.৯.৫৪। এরেভানের মিনিস্ট্রি অব কালচার থেকে আমাদের জন্যে লাঞ্চের পর একটি বিশেষ নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি হল কনসার্ট হল্-এ।

একটি ডিম্বাকৃতি প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে পিঠোপিঠি হয়ে আছে অপেরা হল্ আর কনসার্ট হল্। ভিতর দিয়ে শুধু একটা যাতায়াতের পথ ছাড়া এদিকের সঙ্গে ওদিকের আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

কনসার্ট হল্-এ সাড়ে-তিনটেয় অনুষ্ঠান শুরু হল। ইউরোপীয় ঢঙের অনেকগুলি অনুষ্ঠান হবার পর অসম্বল-এর যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হল। আর্মিনিয়ার এই নিজস্ব যন্ত্রসঙ্গীত আমাদের অদ্ভুত সুন্দর লাগল। মেয়েরা নাচল আর গাইল। যেমন রূপ তেমনি ছন্দ। মনে হল এমন সুন্দর জিনিস এর আগে কখনো দেখিনি। ইউরোপীয় সংস্কৃতির

পালিশটুকু আছে, কিন্তু ভিতরকার আসল বস্তুটুকু এদেশের জলমাটিকে চিনিয়ে দিচ্ছে। এর শৈলীর মধ্যে আরবী আর তুর্কী প্রভাব পুরোপুরি-ভাবে থাকলেও সব মিলিয়ে এ যে নাচ-গান আর সুরের এক নিখুঁত সমন্বয় তা মানতেই হবে।

সুর খুব শাদাসিধে, কিন্তু প্রাণ-মাতানো। দু-একটা নমুনা দিলেই কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে—

১। সজ্ঞম পপ -। প-র্স পদ -। প - জ্ঞ ম- -।
২। ন র্স র্র -। র্স ন দ প। র্সর্স র্সর্স নর্স র্রস। নদ প - -।
৩। গ স গ ম প। গ স গজ্ঞ গম প। গ ম সজ্ঞগ মগ প।
৪। ণ্ - স সস - স - - - সর ম - জ্ঞ রস - স - - - - -

যন্ত্রপাতিগুলো আওয়াজ আর বাজাবার কায়দার দিক থেকে কোনোটা ব্যালালাইকার মতো, কোনোটা এসরাজ আর ব্যাঞ্জো, ম্যান্ডোলিন আর কানুন-এর মতো। কিন্তু চেহারার দিক থেকে একদম আলাদা। কোনোটা ছড়ি দিয়ে বাজাতে হয়, কোনোটা বাজাতে হয় তারে আঘাত করে।

আজ নতুন করে উপলব্ধি করলাম—সঙ্গীত উপভোগ করতে গিয়ে মাথা খাটাবার দরকার নাও হতে পারে। মননের ক্রিয়া যদি বন্ধ থাকে, তাহলেও শরীরের স্নায়ুতন্ত্রে সঙ্গীত এমন এক মূর্ছনা জাগাতে পারে যার ফলে মানুষ মুগ্ধ না-হয়ে পারে না। এদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের বেশ খানিকটা মিল রয়েছে। খানিকটা রাগ, ভাবও আছে। চালটা ভারতীয় না হলেও, বিলিতি মাইনর স্কেলে আমাদেরই কাফি, পিলুর কাছাকাছি স্বরবিন্যাসে ও স্বর পরম্পরায় যেন এক স্বগীর্য় সুষমা গড়ে উঠেছে।

অসুস্থতার দরুন তারা চৌধুরী আজ নাচতে পারবেন না বলে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাঁকে নাচতে হল। দর্শকরা এমনিতেই নাচের ভক্ত। তারা বিশেষ করে পছন্দ করত তারা চৌধুরীর নাচ। তারার নাচের মধ্যে থাকত চমৎকার আঙ্গিক এবং চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনা। তাতে বিদেশী দর্শকরা খুশি হতেন। তাঁর নাচে আকৃষ্ট হবার আরেকটি কারণ তাঁর নির্ভীক সাবলীলতা।

আমাদের চোখে অবশ্য বিলক্ষণ খুঁত ধরা পড়ত। বিশেষ করে সম্পাদনের অভাব। আনুষঙ্গিক সঙ্গীতেরও ত্রুটি ছিল। একটি উত্তর

ভারতীয় কথক নাচ ছিল তারার খুব প্রিয়; তার সঙ্গে সুরিয়নারায়ণ যখন দক্ষিণ ভারতীয় চালে এবং উচ্চারণে 'নীর ভরণে কৈসে যাউ" ধুনটি গাইতেন, শুনলে যে-কোনো ভারতীয় রসিক শ্রোতার পেট ফেটে হাসি পাবার কথা। ওদেশের লোকদের অবশ্য তা বুঝবার উপায় ছিল না।

অন্যান্য দিনের মতো আজকের জলসাও খুব জমল। থিয়েটার থেকে ফেরবার সময় আজও সেই ভিড় আর দুপক্ষের 'দসবিদানিয়া' বিনিময়। তরুণ-তরুণী ছেলে-বুড়োর সেই সাদর সম্ভাষণ।

২৩.৯.৫৪। হোটেলের নিচে আমাদের বিদায়ভোজ দেওয়া হল। গণ্যমান্য অনেকেই এসেছিলেন। নামকরা আর্মানী শিল্পীরা তো বটেই, তাছাড়া এসেছিলেন চারবার স্তালিন পুরস্কার পাওয়া একজন ফিল্ম-প্রডিউসার; মস্কো থেকে কাচাতুরিয়ান; বিখ্যাত একজন কবি, সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ইত্যাদি। সস্ত্রীক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমারই পাশে বসেছিলেন। ভোজের পর মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হল— গ্রামোফোনের কিছু রেকর্ড, সুন্দর-সুন্দর ছবির এ্যালবাম, একটা করে এদেশের ঘণ্টিওয়ালা ঘড়ি এবং নকশা-করা চীনেমাটির জার।

একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা

আড়াইটার প্লেনে উঠে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ৎবিলিসি পৌঁছে গেলাম। মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই এক বিষয়ে আর্মিনিয়ার সঙ্গে জর্জিয়ার একটা মিল চোখে পড়ল। দুজায়গাতেই পুরুষরা গোঁফের ভক্ত।

ৎবিলিসি শহরটা পাহাড়ের উপরে। দার্জিলিংকে মনে করিয়ে দেয়। তবে দিনের বেলা যেমন গরম, রাত্রে তেমনি ঠাণ্ডা। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি দোকানপাট সবই সুন্দর।

সন্ধ্যেবেলা অপেরা-থিয়েটারে কনসার্ট। একটি আইটেম ভারি চমৎকার লাগল। ছাপ্পান্নজন মেয়ে-পুরুষ প্রথমে খালি গলায় গুনগুন করে একটা সুর ধরল, সেই সঙ্গে একজন ভারি গলায় একটি জাতীয় কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। আবৃত্তিকারের কণ্ঠস্বর কখনো উঠছে কখনো নামছে, কখনো ক্ষীণ কখনো ওজস্বী; ছাপ্পান্নটি নারী-পুরুষের গলায় গলা মেলানো অসামান্য একটি সুর শুধু তার পটভূমি।

সঙ্গে কোনো যন্ত্রসঙ্গীত নেই। মাঝে-মাঝে শুধু পিয়ানোর টুং-টাং।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটির জর্জীয় অনুবাদ একজন গায়ক খুব ওজস্বী ভঙ্গিতে গেয়ে শোনালেন। একটি চেলো আর তিনটি বেহালার একটি নতুন ধরনের কোয়ার্টেট শুনলাম। হারমনি আছে, কিন্তু ইউরোপীয় ছাঁদে নয়—খানিকটা এরেভানে শোনা যন্ত্রসঙ্গীতের মতো। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত লয়ে চারটি যন্ত্রেই পিজিকাটো চালের বাজনা বাজল।

শাদা ধবধবে পোশাক-পরা একুশজন নর্তকীর আবেগ-জাগানো নাচ-গান এরেভানের কথা মনে করিয়ে দিল।

বিরতির পর শুরু হল লোকনৃত্য। বাজনার মধ্যে এ্যাকর্ডিয়ন, সানাই গোছের বাঁশী, দুটি প্রস্থে কম কিন্তু বড় মুখওয়ালা দড়ি-টানা ঢোল। নাচগুলো বেশির ভাগই হল দল বেঁধে, মাঝে-মাঝে একক।

চারজন কন্দর্পকান্তি ছেলে আর একটি সুন্দরী মেয়ে যে নাচটি দেখাল তার নাম : 'তুমি কত সুন্দর।' আজারবাইজানের একটি নাচে দেখলাম এক অদ্ভুত ধরনের পা ফেলবার কায়দা। প্রত্যেকটি নাচের মধ্যেই আছে প্রভূত পরিশ্রম আর কসরতের পরিচয়। অনায়াসে সার্কাসের কোঠায় তাকে ফেলা যায়। কিন্তু ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা আর ক্রিয়াসাম্যে অপূর্ব।

একটি সাজনৃত্য দেখে তো হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরবার যোগাড়। বাজনার তালে-তালে দুটি লোক ঝটাপটি করতে-করতে স্টেজে ঢুকল। এ ওকে জাপটে ধরে দুজনে সে কী লড়াই! একবার এ ওকে ফেলে দেয়, একবার ও একে আছাড় মারে। সব কিছুই হয় নাচের তালে-তালে। লড়তে-লড়তে দুজনে এসে গেছে স্টেজের একেবারে ধারে—একজন এই পড়ে তো এই পড়ে! দুটো পা-ই নিচে ঝুলে পড়েছে! হঠাৎ এক ঝটকায় সে নিজেকে সামলে নিল। তারপর আবার ঝটাপটি করতে-করতে দুজনে তুমুল লড়াই। দুজন মানুষ এতক্ষণ ধরে এত প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লড়াই করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

দেখি—আরে, আরে, এ আবার কি! একজন যে উইংস-এর পাশের দেয়াল বেয়ে উঠেই চলল! অবাক কাণ্ড তো বটেই, কিন্তু হাসতে-হাসতে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে শেষে কি পৈতৃক প্রাণটা রেখে যেতে হবে? বাজনা

আর নাচ হঠাৎ একই সঙ্গে থেমে গেল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেখা গেল একজন নৃত্য-অভিনেতা তাঁর পোশাক খুলে ফেলছেন; আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, একমাত্র তখনই আমরা বুঝতে পারলাম মাত্র একজন শিল্পী এতক্ষণ ঐ অদ্ভুত পোশাকটা পরে একাই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আকার ধারণ করেছিলেন। চোখের উপর এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটতে দেখে আমরা থ হয়ে গেলাম। এর পর দেখলাম ছেলে-মেয়েদের রুমাল-নৃত্য, ঘোড়সওয়ার-নৃত্য, ঢালতলোয়ার-নৃত্য সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ রকমের জিনিস। ডিরেক্টার তাঁর খাসকামরায় বসিয়ে আমাদের চা, কফি, ফল, লেমোনেড খাওয়ালেন। প্রেক্ষাগৃহে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে হলভর্তি লোক করতালি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। বিদেশী বন্ধুদের এরাই সমাদর করতে জানে।

ৎব্লিসি শহরে

২৪.৯.৫৪। লাঞ্চের পর শহর দেখতে বেরোলাম। এক জায়গায় একটি বিরাট পার্ক তৈরি হচ্ছে, আর এক জায়গায় একটি স্টেডিয়াম। চারদিকে আরো অনেক দালানকোঠা উঠছে। যে বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়, তার আশে পাশে বেশ খানিকটা ঘোরা গেল।

এত বড় শহর, লোক মোটে ছ'লক্ষ। এখানে-ওখানে নানা রীতির স্থাপত্য দেখবার পর একটি পাহাড়ী রাস্তার উপর চতুর্থ শতাব্দীর একটি পুরোনো কেল্লার ভাঙা পাঁচিল দেখলাম। শহরের উপর দিয়ে গেছে কুরা নদী; সাত জায়গায় আছে পারাপারের সাতটি পুল। শহরে এমন গির্জেও অনেক আছে, যা তৈরি হয়েছে আজ থেকে কম পক্ষে দেড় হাজার বছর আগে। শহরের সব কিছুর মধ্যেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির ছাপ। দেখলাম ইংরেজীতে কথাও বলতে পারে অনেকে। টেলিভিশান এখনো এখানে না এলেও আগতপ্রায়। জর্জিয়ার লোকসংখ্যা বেশি নয়, মাত্র পঁয়ত্রিশ লক্ষ।

২৫.৯.৫৪। সকালে গেলাম পাইওনিয়ারদের প্রাসাদ দেখতে। অনেকখানি জমিতে অনেকগুলো বাড়ি নিয়ে সাত থেকে সতেরো বছরের ছেলে-মেয়েদের এই প্রতিষ্ঠান। অনেকগুলো বিভাগ। আমরা যেতেই ব্যান্ড বেজে উঠল। আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজেদের স্টেজের উপর তাদের

নাচগান আর নানারকমের কসরত দেখাল। অনুষ্ঠানের পর আমাদের দলের নেত্রীকে তারা চঙ্গুরী নামে একটি বাদ্যযন্ত্র উপহার দিল। আমাদের প্রত্যেকের গলায় সাদরে বেঁধে দিল একটি করে লাল রঙের রেশমী স্কার্ফ।

এখানে আছে দশ হাজার কিশোর ছাত্রছাত্রীর চারশোটি চক্র। কার কোনদিকে প্রবণতা তা দেখে ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগে তাদের ভর্তি করা হয়। বড়-বড় বিশেষজ্ঞেরা এই বিভাগগুলো চালান।

ছোটদের তৈরি এরোপ্লেন, জাহাজ এবং অন্যান্য জিনিসের উচ্চাঙ্গের মডেল দেখলাম। এক জায়গায় তাদের নিজেদের পুতুলনাচ দেখলাম। একটি মস্ত হল্-এ শতাধিক সাত-আট বছরের শিশু এ্যাকর্ডিয়নের তালে-তালে নাচছিল। আমাদের দেখে তারা হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচতে হল, তবে তারা ছাড়ল।

একদল ছেলে-মেয়ে স্প্যানিশ গীটার বাজিয়ে গান শোনাল। যারা ইংরেজি ভাষা শেখে, তারা ইংরেজি আবৃত্তি করে শোনাল। একটি ছবি আঁকার ক্লাসে গিয়ে দেখি তাদের নিজেদের আঁকা অনেক সুন্দর-সুন্দর ছবির মধ্যে রয়েছে তেল-রঙে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি। খোদাই-কাজও অনেক দেখলাম।

ছেলে-মেয়েরা দেখলাম আরো নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ডিং করছে, কেউ বা গভীর মনোযোগ দিয়ে ইতিহাস কিম্বা ভূগোলের ক্লাস করছে। এদের বেতার ব্যবস্থা শেখবারও নিজেদের বন্দোবস্ত আছে।

কেউ শিখছে কৃষিবিদ্যা। ফলের বাগানে চাষের কাজ যারা করে তারা আমাদের এনে দিল আঙুর, আপেল এবং আরো রকমারি ফল। তাছাড়া আছে খেলাধুলো, ব্যায়াম আর নানারকমের কসরত শিখবার ব্যবস্থা। একটি ব্যায়ামাগারে দেখলাম একসঙ্গে পঞ্চাশটির বেশি মেয়ে ব্যায়ামের পোশাক পরে পিয়ানোর তালে-তালে ব্যায়াম অভ্যাস করছে। এদের নিজস্ব দমকল আছে। এক জায়গায় ছোটদের দমকল বাহিনীর নানা-রকমের কুচকাওয়াজ দেখলাম।

তারপর আমরা গেলাম শহর থেকে কিছুটা দূরে এক মস্ত বড় আঙুরখেতে। মাঝখানে এক ফালি রাস্তা, দুপাশে আঙুর গাছ। গাছগুলো

খুব উঁচু নয়। এক মানুষ সমান হবে। যেতে-যেতে আমরা গাছ থেকে আঙুর নিয়ে ক্রমাগত খেতে লাগলাম। এক-একজন যে ক-সের করে খেল তা আন্দাজ করা কঠিন। রবিশঙ্কর বললেন, 'দেশে ফিরে আর দু-বছর আঙুর খেতে হবে না।'

লাঞ্চের পর বেরোনো হল ছোটদের রেলওয়ে দেখতে। যেতে একটা বেশ চওড়া রাস্তা পড়ল। তার উপরটা লতাগুল্ম দিয়ে ছাওয়া বলে মনে হল। খানিকক্ষণ যাবার পর একটু নজর করে দেখলাম সত্যিই লতানে গাছ। তবে যেমন-তেমন গাছ নয়, সুমধুর ফলভারে অবনত আঙুর-গাছ।

রেলস্টেশনে পৌঁছে দেখি, যারা কাজ করছে তাদের সকলেরই বয়স বারো থেকে আঠারোর মধ্যে। ছোটদের এই রেলপথটি তৈরি হয় ১৯৩৫ সালে। দেড় হাজার ছেলেমেয়ে এখানে রেলের কাজ শেখে। দেড় কিলোমিটার লম্বা এই রেলপথে তিনটি স্টেশন আছে। মিনিট পনেরো-কুড়ি ছোটদের রেলগাড়িতে চড়ে আমরা বেড়িয়ে এলাম।

স্তালিনের জন্মস্থানে

সকালে প্রাতরাশের পর দল বেঁধে আমরা গোরির দিকে রওয়ানা হলাম। গোরি গ্রামে স্তালিন জন্মেছিলেন।

পথে পড়ল একাদশ শতাব্দীর একটি গির্জা। দেয়ালের গায়ে সুন্দর-সুন্দর অনেক ফ্রেস্কো। তার মধ্যে যিশুখৃষ্টের একটি অপূর্ব ছবি। ভিতরে উপাসনা চলছিল। ভিড় খুব বেশি নয়। সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ পাদ্রীর সঙ্গে দেখা হল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা মোটরে গোরি গিয়ে পৌঁছে গেলাম। একটি ছোট একতলা বাড়ির যে ঘরে স্তালিন জন্মেছিলেন এবং চার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর মা'র সঙ্গে ছিলেন, সেই ঘরটা আমাদের দেখানো হল। বাড়িটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ছাদের কিছুটা উপরে আর একটি মজবুত পাথরের ছাদ তৈরি করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবে রাখা আছে একটি তক্তাপোশ, একটি টেবিল, কতকগুলো টুল, জলাধার এবং অন্যান্য আসবাবপত্র।

পাশেই একটি মিউজিয়াম। ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র, দলিল, পুঁথি, প্রতীক আর ছবির ভিতর দিয়ে স্তালিনের জীবনকাহিনী বলা হয়েছে।

স্তালিনের বাবা কাজের খোঁজে ১৮৭০ সালের গোড়ার দিকে গোরিতে আসেন। তাঁর বিবাহ হয় ১৮৭৪ সালে। তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান দুটি শৈশবেই মারা যায়। ১৮৭৯ সালে স্তালিন জন্মগ্রহণ করেন। ন'বছর বয়সে একটি থিওলজিকাল স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর ভালো গানের গলা ছিল। একটি ছবিতে দেখলাম স্কুলে তিনি গান গাইছেন। বছর পনেরো বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি হয়।

মিউজিয়ামের মধ্যে এক বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হল। স্তালিনের সঙ্গে তিনি পড়তেন। তাঁর মুখে স্তালিনের কিছু-কিছু জীবনকথা শুনলাম। তাঁর মা আর স্তালিনের মা দুজনে প্রাণের বন্ধু ছিলেন। কত সময় তাঁরা সস্নেহে সন্তান বিনিময় করে স্তন্যদান করেছেন। পাঠ্যাবস্থায় স্তালিন জর্জীয় ভাষায় অনেক কবিতা লিখেছিলেন। সে সময়কার পত্রিকায় সে সব কবিতা প্রকাশিতও হয়েছে। ১৯১৬ সালে তাঁর কবিতা স্কুলপাঠ্যের তালিকাভুক্ত হয়। ১৮৯৯ সালে যখন স্তালিন স্কুলের পড়া প্রায় শেষ করে এনেছিলেন সেই সময় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ থাকার অপরাধে স্কুল থেকে তিনি বহিস্কৃত হন। ১৯০১ সাল থেকে তাঁর বিপ্লবী জীবন পুরোদমে শুরু হয়। স্তালিন জীবনে সব সুদ্ধ সাতবার বন্দী এবং ছ-বার নির্বাসিত হন; পাঁচবার বন্দীদশা থেকে পালান।

চীনা শিল্পীরা রেশমী সুতোয় বুনেছিল স্তালিনের একটি ছবি—দেখলে ফোটোগ্রাফ বলে ভুল হয়।

ৎব্লিসিতে ফিরে বিশ্রামের তেমন সময় পাওয়া গেল না। সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ভোজসভার ব্যবস্থা হয়েছে। অগত্যা আবার বেরোতে হল। অনেকখানি পাহাড়ী পথ ঘুরে আমরা পেঁছিলাম ৎব্লিসির সর্বোচ্চ চূড়ায়। একটি চমৎকার বাগান। তার এক পাশে বিরাট প্রাসাদের মতো ফিউনিকিউলার স্টেশন। তার উপরতলার হোটেলে ভোজসভার আয়োজন হয়েছে।

ফিউনিকুলার হল বাসের মতো বসবার আসনযুক্ত একটি গাড়ি। মোটা মতো পাকানো তারের সাহায্যে পাহাড়ের চূড়া থেকে পাদদেশে লিফ্‌টের মতো আসা-যাওয়া করে।

টোস্ট এবং বক্তৃতার পর খাবার টেবিলেই গান শুরু হয়ে গেল। অভ্যাগতেরা সোৎসাহে গলা মিলিয়ে উৎসব মাতিয়ে তুললেন। সুরেন্দর,

মীরা, মস্তানা, তম্বিনো—এঁরাও কিছু-কিছু গাইলেন। সুরেন্দরের কাছে তক্ষুণি একটা ঘুমপাড়ানি গান শিখে নিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে সুরেন্দরের সঙ্গে গাইতে শুরু করে দিলেন এক জর্জীয় শিল্পী।

খানিক পরে দেখি একদল পরিবেশনকারী একটি ট্রেতে ধরাধরি করে আনছে প্রকাণ্ড একটি আস্ত টার্কি পাখি, ভেড়া এবং আরো কি যেন সব। ওগুলো যে যাদুঘর থেকে আসেনি, সুঘ্রাণ এবং সুস্বাদ থেকে তা বুঝে নিতে দেরি হল না।

ডাইনিং হল্‌ থেকে বেরিয়ে পাশে প্রকাণ্ড খোলা বারান্দা। নিচেটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সমস্ত শহর যেন আলোর একটি সমুদ্র। জর্জিয়ার বিচিত্র জাতীয় পোশাক উপহার নিয়ে বিনা চাকার বাসে নিচে নামতে একটুও সময় লাগল না।

ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ায়

২৭.৯.৫৪। সারা রাত বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাত। আবহাওয়া খারাপ থাকায় যথাসময়ে প্লেন ছাড়েনি। প্লেন ছাড়ল নটা-পনেরোয়। আবহাওয়ার অবস্থা তখনো সুবিধের নয়। বেশ ঝাঁকুনি লাগছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাকুতে নামতে হল। বারোটায় বাকু ছাড়লাম। তারপর একটানা এক ঘণ্টা ধরে কাস্পিয়ান সমুদ্রের ফিকে নীল জলের উপর দিয়ে ক্রমাগত উড়ে যাওয়া।

তুর্কমেনিস্তানের প্রধান শহর আস্কাবাদে প্লেন পৌঁছুল পোনে-তিনটেয়। বেজায় শুকনো দেশ। যেন অন্ধ্রের কোনো গ্রামাঞ্চলে এসেছি। বিমানঘাঁটির অবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়। যাত্রীদের জন্যে তেমন সুব্যবস্থা নেই। রোদ্দুর দারুণ কড়া। খাবার জায়গাটা শাদাসিধে, জানলার কাঁচে নীল রঙ দেওয়া। পরিবেশনকারিণীরা সংখ্যায় কম। ডালের সুপ, একটা করে চপ আর ময়দার ডেলার মতো কী একটা দিয়ে লাঞ্চ সারতে হল। সাড়ে-তিনটেয় প্লেন ছাড়ল।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা এসে নামলাম উজবেকস্তানের প্রধান শহর তাসখন্দে। তাসখন্দের ঘড়িতে অবশ্য তখন রাত নটা। মাটিতে পা দিতে না দিতেই জোরালো আলোয় ছবি তোলার মরশুম শুরু হয়ে গেল। তারপর চলল একাধিক বক্তার স্বাগত অভিনন্দন এবং প্রত্যাভি-নন্দনের পালা।

শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এক সরাই-খানায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। জায়গাটা হোটেলেরই মতো; অনেকগুলো একতলা ছোট-ছোট কটেজ। প্রধান বাড়িটা দোতলা। সেখানেই স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা। পৌঁছে দেখি সোভিয়েট দেশে ভ্রমণরত আর একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত।

উজবেকস্থানের নামকরা নৃত্যশিল্পী মুকারম তুরঘুন বাইভা এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সোভিয়েট দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সেই সময় তারার সঙ্গে তাঁর আলাপ। আমরা তাসখন্দে আসায় তিনি এত খুশি হয়েছিলেন বলবার নয়।

কয়েকটি ঘর নিয়ে এক-একটি কটেজ। একটি কটেজে একটি পায়খানা, অথচ কটেজ পিছু লোক আমরা আট-দশজন। স্নানের জন্যে ছুটতে হবে সেই দোতলা বাড়িতে। কিন্তু সমস্ত অভাব ভুলে যেতে হল খাবার টেবিলে বসে। পোলাও, কালিয়া, কোর্মা—একের পর এক যখন আসতে থাকে, মনে হয় নিজের দেশে এসে গিয়েছি। আপেল, পেয়ারা, আঙুরের অভাব অবশ্য গোড়া থেকে কোথাওই হয়নি, তবে তাসখন্দের আঙুরগুলো আকারে যেন ছোট-খাটো আলুর মতো।

তাসখন্দ শহর

২৮.৯.৫৪। সকালে প্রাতরাশের পর শহর দেখতে যাব। তার আগে শহরের বৃদ্ধ স্থপতি এখানকার দর্শনীয় জিনিসগুলোর ছোট্ট ইতিহাস বললেন।

উজবেকস্থানের প্রধান শহর এই তাসখন্দ। অনেকটা মরুদ্বীপের মতো এর অবস্থান। পশ্চিমে মাত্র মাইল এগারো দূরে কারাকুম মরুভূমি। প্রাচীনকালে তাসখন্দ ছিল বণিকদের পণ্য-বিনিময়ের জায়গা। জলাভাবের দরুন চাষবাস হত না বললেই হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত এই ছিল এখানকার অবস্থা। আজ আর সেই পুরোনো দিনের তাসখন্দ নেই। দেশ জুড়ে এখন সেচ-ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস হচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি তুলো এইখানেই হয়।

শহরের পুরোনো এলাকাগুলো দেখলেই বোঝা যায় এখানকার

বাসিন্দারা এককালে কী দুর্দশায় দিন কাটাত। ক্রমবর্ধমান নতুন এলাকাগুলো সুখ-শান্তি আর প্রাচুর্যের পরিচয় বহন করছে। যে-দেশের বেশির ভাগ লোক নাম সই করতে জানত না, সে-দেশে শুধু উচ্চশিক্ষা আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যেই প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রাসাদ উঠেছে।

শহরের মধ্যে এগারোটি বড়-বড় পার্ক। লাল ময়দানে লেনিনের মস্ত মূর্তি। এই ময়দানের চারপাশে যেসব স্থাপত্যের নিদর্শন দেখলাম নিঃসন্দেহে তা মস্কো-লেনিনগ্রাড-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

একটি থিয়েটার দেখলাম। ১৯৪৭ সালে তৈরি হয়েছে। এটি তৈরি করেন রুশ স্থপতিরা। উজবেকস্থানের প্রতিভাবান কারুশিল্পীরাও তাঁদের সাহায্য করেন। প্রধান প্রেক্ষাগৃহ ছাড়াও অনেকগুলি হল্। এক-একটি হল্-এর দেয়ালে, আলসেতে, কার্নিসে উজবেকস্থানের এক-এক প্রদেশের বিশেষ-বিশেষ শিল্পকর্মের নমুনা। ফরঘনা, সমরখন্দ, তের-মিজ, বোখারা এবং আরো নানা জায়গার রকমারি নক্সা আর কারুকার্য। প্লাস্টারের কাজই বেশি, পাথরের কাজ কম।

সুন্দর-সুন্দর দেয়ালচিত্রও দেখলাম—শিরী-ফরহাদ, লয়লা-মজনু। তাসখন্দের নিজস্ব কারুকার্যের মধ্যে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বোখারার মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার ঠাসবুনানি নয়, এঁদের নক্সার মধ্যে উচিতমতো ফাঁকা জায়গা ছেড়ে রাখা হয়।

শরীরের উপর এই একটানা ধকল আর সহ্য হচ্ছিল না। পেট বেঁকে বসল। ভুক্তভোগী রবিশঙ্করের ব্যবস্থাপত্র মেনে নিয়ে দিনটা কয়েকটি ডালিম, কড়া চা আর কড়া করে সেঁকা পাঁউরুটির উপর থাকলাম। এদিককার ডালিম আকারে প্রকাণ্ড, লাল টুকটুকে দানা, কিন্তু বেজায় টক। পেটের গোলমালের পক্ষে নাকি খুব উপকারী।

রাত আটটায় একটি নাচগানের অনুষ্ঠান দেখতে গেলাম। ভিড়ে তিলধারণের স্থান নেই। গিয়ে শুনলাম নব্য চীনের স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে আজ একটি উৎসবেরও এখানে আয়োজন হয়েছে। প্রথমে বক্তৃতা দিতে উঠলেন সোভিয়েটের একজন প্রতিনিধি। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্ক আর সেই সঙ্গে চীনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা বলতে-বলতে মার্কিন কূটনীতি আর চীনকে জাতিসঙ্ঘের বাইরে রাখার কুচক্রান্তের কথা তিনি খোলাখুলি ভাবেই বললেন।

চীনের প্রতিনিধিও তারপর বক্তৃতা দিলেন।

হেনরিয়েটা আমার পাশে বসে বক্তৃতাগুলো রুশ থেকে ইংরেজিতে তর্জমা করে শোনাচ্ছিল। এই সময় সে তার শরীরে হঠাৎ স্নায়ুঘটিত একটি ব্যথা অনুভব করতে থাকে। মনে হচ্ছিল এক্ষুণি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমি ওকে অনেক করে বারণ করলাম কিন্তু কিছুতেই শুনল না, বক্তৃতার পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমানে তর্জমা করে যেতে লাগল। নাচগান আরম্ভ হবার পর একটু যখন সুস্থ বোধ করল, তখন হেনরিয়েটা হল্ থেকে বেরিয়ে গেল।

লাল রঙের ভেলভেটে স্টেজটি সাজানো। বক্তৃতার পর কনসার্ট। দেশী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রায় ষাট-সত্তরজনের একটি দল সিম্ফনি বাজালেন। তারপর উজবেকস্থানের নানা অঞ্চলের নাচগান আর রুশ-চীনের নানা-রকম লোকনৃত্য-গীতের সঙ্গে একরকমের তাল-বাদ্য বাজতে দেখলাম। নাম ডয়রা। দেখতে মস্ত বড় গোল ট্যাম্বুরিনের মতো। অর্কেস্ট্রার সঙ্গে দেশী আর ক্লাসিক—সব রকম গানই হল। সবগুলো গানই শোনবার মতো।

বিরতির পর একটি অর্কেস্ট্রা শুনে আমাদের দলের অভিজ্ঞ মহলে সাড়া পড়ে গেল। রবিশঙ্করের 'ক্যারাভ্যান' নামে যে অর্কেস্ট্রাটি গ্রামো-ফোনের রেকর্ডে আছে, সেটাকেই এঁরা অদল-বদল করে নিয়েছেন। তখনো পর্যন্ত তাঁরা জানেন না এই অর্কেস্ট্রার রচয়িতা তাঁদেরই সামনে শ্রোতা হয়ে বসে আছেন।

কনসার্টের পর সোজা সরাইখানায় ফিরলাম। নানারকম অসুবিধা অব্যবস্থার মধ্যেও আমাদের আনন্দ দেবার জন্য এঁদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ঘরে নতুন একটা প্লাগ-পয়েণ্ট বসিয়ে একটি রেডিও সেট লাগিয়ে দেওয়া হল।

২৯.৯.৫৪। কী মাছি! কী মাছি! মাছির জ্বালায় ভোরের ঘুমটা সকলেরই মাটি হয়ে গেল। ভারতীয় সঙ্গীতের উপর একটা প্রবন্ধ লেখবার জন্যে সাংবাদিক ওকভ বলেছিলেন। লিখব কি, বুক পর্যন্ত লেপ দিয়ে ঢেকেও রেহাই নেই—চোখ, কান, নাকের উপর তারা অনবরত হামলা করছে।

দুপুরে দই-ভাত খেয়ে বাজারে বেরোলাম। বিছানার একটি রঙিন রেশমী ঢাকা দুশো-ঊনত্রিশ রুবল এবং দুটো স্কার্ফ সত্তর রুবল দিয়ে কিনলাম।

রাত্রের শো মন্দ হয়নি। শকুর খাঁর নগমার সঙ্গে তাসখন্দে আমি এই প্রথম সোলো তবলা বাজালাম।

তাসখন্দের খাওয়া-দাওয়া সকলেরই খুব পছন্দ। রান্না অনেকটা ভারতীয় ধাঁচের। তাছাড়া পরিচারিকাদের ভারি মিষ্টি আন্তরিক ব্যবহার।

নৃত্যগীত শিক্ষায়তন

৩০.৯.৫৪। সকালে চায়ের পর সঙ্গীত শিক্ষায়তন দেখতে গেলাম। অধিকর্তা মুখতার আসরফি স্বয়ং একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতবিদ। তাঁর কাছে উজবেকস্থানের সঙ্গীত-প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত শুনলাম। রুশবিপ্লবের আগে এদিকটায় অপেরা, কনসার্ট, ব্যালে বলতে কিছু ছিল না। লোক-সঙ্গীত যা ছিল, তাও অনুন্নত অবস্থায়। পরে অপেরা সিম্ফনি যেমন এল, তেমনি লোকসঙ্গীতকেও মেজে-ঘষে পরিবেশনের উপযোগী করে তোলা হল। লোকসঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে রসিকদের কাছে রসোত্তীর্ণ করাই এঁদের লক্ষ্য। তার জন্যে লোকসঙ্গীতের মধ্যে যেখানে দরকার হার্মনি, যেখানে দরকার সিম্ফনি, তা আমদানি করতে তাঁরা দ্বিধা করেন না। এখানকার সঙ্গীত যে এত তাড়াতাড়ি উন্নত হতে পেরেছে তার পিছনে আছে রুশদেশবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতা।

উজবেকস্থানের সমস্ত বড়-বড় শহরে প্রথম সঙ্গীত শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০০ সালে। তখনো এ অঞ্চলে স্বরলিপির প্রচলন হয়নি। সাধারণ মানুষ বরাবরই নাচ-গানের ভক্ত হলেও, সম্ভ্রান্ত সমাজের চোখে নাচ-গান জিনিসটাই হেয় ছিল। ১৯২৬ সালে প্রথম স্টেজবাঁধা থিয়েটারের পত্তন হয়। তার আগে পর্যন্ত ছিল শুধু ভ্রাম্যমান নাট্যসম্প্রদায়। ১৯৩৭ সালে মস্কোর প্রথম অলিম্পিয়াড্-এ উজবেক নাট্যগীত প্রদর্শিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এ-দেশে প্রযোজিত হয়েছে চারটি অপেরা, সাতটি ব্যালে এবং বেশ কয়েকটি সিম্ফনি। উজবেকস্থানে পঞ্চাশজন সঙ্গীতস্রষ্টার একটি সঙ্ঘ আছে।

আমরা যে শিক্ষায়তনটি দেখলাম, সেখানে সঙ্গীতের উচ্চশিক্ষা দেওয়া

হয়। ১৯৩৬ সালে এর প্রতিষ্ঠা। দশ বছর সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর এই শিক্ষায়তনে পাঁচ বছর ধরে তালিম নিতে হয়। এখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের সাতটি ফ্যাকাল্টি আছে: সঙ্গীত রচনা, কণ্ঠসঙ্গীত, ঔপপত্তিক-সঙ্গীত, সঙ্গীত পরিচালনা, অর্কেস্ট্রা, পিয়ানো, লোকসঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র। লোকসঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রে এমন সব পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে করে এখন সিম্ফনি পর্যন্ত বাজানো চলে। ভাষা এবং অর্থনীতিও এখানকার পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। শিক্ষক আছেন দেড়শো। প্রতি দুজন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক। মাসে ২০০ থেকে ৭০০ রুবল পর্যন্ত ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়। বাইরের ছাত্রদের জন্যে আছে ছাত্রাবাস।

কতটা কি শিখেছেন একটি অনুষ্ঠান মারফত তার নমুনা দিলেন ছাত্র-ছাত্রীরা। এখানকার নিজস্ব সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য যেমন লক্ষ্য করবার মতো, তেমনি সেই সঙ্গে এও দেখলাম ইউরোপীয় সঙ্গীতের আদর্শে মার্জিত এবং খানিক প্রভাবিত হয়ে একটা নতুন অথচ দেশী রূপ নিয়ে সেই সঙ্গীত সত্যিই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। শুধু রুশ দেশের নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেরও আরো অনেক সুর তাঁরা গেয়ে কিম্বা বাজিয়ে শোনালেন। সানন্দে অবাক হলাম যখন অর্কেস্ট্রায় বাঙলার লোকসঙ্গীত বলে শুনলাম রবীন্দ্রনাথের 'না গো না, কোরো না ভাবনা।'

এই প্রতিষ্ঠানেরই আর এক অংশে ব্যালে স্কুল। ১৯৩৪ সালে এর প্রতিষ্ঠা। এখানে উচ্চাঙ্গ নৃত্য ও লোকনৃত্য দুই-ই শেখানো হয়। এখান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে বড়-বড় অপেরা আর ব্যালে প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। সাত থেকে আঠারো বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন নৃত্যে অপূর্ব কলানৈপুণ্যের পরিচয় পেলাম।

তারপর আমরা গেলাম কাপড়-কল দেখতে। এখানে কাপড় তৈরি হয় দৈনিক দু-লক্ষ ঊনিশ-হাজার গজ। ত্রিশ হাজার কর্মী নিয়ে প্রকাণ্ড কারখানা। প্রতি তিনমাসে ছাপা কাপড়ের সাতশো রকমের নক্সা বার হয়। কাপড়-কলের শ্রমিকদের নিজস্ব সংস্কৃতিকেন্দ্র, নিজস্ব থিয়েটার আছে। তাছাড়া আছে সুন্দর বাসগৃহ এবং কর্মরত মায়েদের শিশুসন্তান রক্ষণাবেক্ষণের দশটি ক্রেশে।

সকালে মুকারম তুরঘুনবাইভার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। একটি সাধারণ পাড়ায় খুব সাধারণ একটি বাড়িতে মা আর বোনের সঙ্গে তিনি

থাকেন। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এ যেন যুক্ত প্রদেশ কিম্বা বিহারের কোনো মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি। কিন্তু ঘরে ঢুকে যখন চারদিকের আসবাব-পত্র আর দামী কার্পেটের উপর চোখ পড়ে তখন ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। গৃহস্বামিনী সত্যিই অবস্থাপন্ন। মুকারম একজন স্তালিন-পুরস্কার পাওয়া নৃত্যশিল্পী। আয়োজনের মধ্যে আড়ম্বরের চেয়ে আন্তরিকতাই বেশি প্রকাশ পেল। এটা খাও, ওটা খাও বলে বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। রেকর্ডে কোন একটা ভারতীয় ফিল্মের গান বাজছিল। আমাদের খাওয়াতে-খাওয়াতে হঠাৎ দেখি মুকারম তালে-তালে নাচতে শুরু করে দিয়েছেন। থাকতে না পেরে গোপীনাথ, নদিয়াঁ, বিজয়রাঘবও তাঁর সঙ্গে নাচে যোগ দিলেন।

আজ শেষ জলসা। কোনোরকম আনুষঙ্গিক যন্ত্র ছাড়াই পরীক্ষা-মূলকভাবে আমি সোলো তবলা বাজালাম। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম।

যৌথ-খামার

১.১০.৫৪। এতদিন এসেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কৃষি, বাণিজ্য, যন্ত্রবিজ্ঞানে সোভিয়েটের অগ্রগতির ঘাঁটিগুলো দেখবার বড় একটা সুযোগ কিম্বা সময় পাইনি। যেটুকু পরিচয় হয়েছে, তার সবটাই প্রায় সোভিয়েটের শিল্পকলার জগৎ।

তাই হাতের কাছে একটা যৌথ-খামার পেয়ে যাওয়ায় তাই দেখতে আমরা ছুটলাম। অবশ্য সোভিয়েট দেশে যেসব বড়-বড় যৌথ-খামার আছে, তার তুলনায় আমরা যেটা দেখলাম সেটা নিতান্তই নগণ্য। তাহলেও খানিকটা তো আন্দাজ পাওয়া যায়।

যিনি চেয়ারম্যান তাঁর কাছে এই খামারের বিশদ বিবরণ শুনলাম। এগারোটি চাষের খেত এক করে এই যৌথ-খামার তৈরি হয়েছে। স্তালিনের নামে এর নামকরণ হয়েছে। প্রায় সাড়ে-ছত্রিশশো একর জমি নিয়ে এই এলাকা। বাস করে আটশো-আটচল্লিশটি পরিবার। লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর। তার মধ্যে সাড়ে-নশো কর্মী। স্কুল আছে পাঁচটি। তিনটিতে দশ বছরের পাঠক্রম, দুটিতে সাত বছরের। স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা দু-হাজার; এখানকার দেড়-হাজার ছাত্র-ছাত্রী কেউ মস্কোয়, কেউ লেনিনগ্রাডে পড়ে। একটি হাসপাতাল এবং চারটি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে।

ক্রেশে আছে পাঁচটি, কিন্ডারগার্টেন দুটি। এখানকার বাসিন্দাদের তিনটি ক্লাব আছে।

খেত-খামারের কাজের জন্য আছে আঠারোটি ব্রিগেড; তার মধ্যে শস্য আর সব্জি উৎপাদনের কাজ করে ষোলোটি, একটি করে নির্মাণের কাজ এবং বাকি ব্রিগেডটি খড়বিচালি সংক্রান্ত কাজ করে। চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক নিয়ে এক-একটি ব্রিগেড। এই এলাকায় দোকান আছে বত্রিশটি, বারোটি মুদিখানা। এখানকার দুশো ফলের বাগানে শুধু আপেলের গাছই আছে বিশ হাজার। যৌথ-খামারে ঘোড়া আছে দুশো-সত্তরটি, ভেড়া সাড়ে-পাঁচ-হাজার, গাইগরু আর বলদের সংখ্যা পাঁচ-হাজারের উপর। তাছাড়া শুয়োর আছে দেড়শো আর পোলট্রি পাঁচশো।

গত বছর এখানে এঁরা সত্তর লক্ষ রুবল মূল্যের ফসল ফলিয়েছিলেন। এ বছর এঁরা আশা করেন সংখ্যা বেড়ে আশী লক্ষ দাঁড়াবে। যে কৃষকেরা যৌথ-খামারের কাজ করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের কিছু না কিছু নিজস্ব জমি আছে। যৌথ-খামারের সম্পত্তি ছাড়াও প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের পাঁচ-ছটি করে গরু, ভেড়া এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু থাকে। অনেকের মোটরগাড়িও আছে। এই যৌথ-খামারের ত্রিশটি মোটর-গাড়ি, ষোলোটি লরি আর চারটি ট্র্যাক্টর আছে। চেয়ারম্যান-এর নিজের একটি 'জিস' গাড়ি আছে। কিছুদিনের মধ্যেই আরো বেশি দাম দিয়ে তিনি একটি 'জিম' গাড়ি কিনতে পারবেন বলে আশা করেন। যৌথ-খামারের কর্মীদের মজুরি হিসেবে মাইনে দেওয়া হয়। বেসরকারী যৌথ-খামারে উৎপাদন অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলাম। সেলার-এর মধ্যে আর মাটির নিচে পিঁপে-ভর্তি টাটকা মদ জমিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু চোখেই দেখলাম না, চেখেও দেখলাম। কৃষকদের চমৎকার ঘরবাড়ি আর থাকবার ব্যবস্থা। ঘরের একদম গায়ে আঙুরের বাগান। বাগান থেকে আমরা যত ইচ্ছে পেড়ে-পেড়ে খেতে লাগলাম।

গান-পাগল জাত এরা। দুপুরের খাওয়াটা না খাইয়ে ছাড়ল না। আমরা বসে খেতে লাগলাম আর সেই সঙ্গে নাচগান চলতে লাগল। তাদের এমনি উৎসাহ, এরই মধ্যে কোথা থেকে রেকর্ডিং-এর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আনিয়েছে। খাবার টেবিলে বসেই মীরা, সুরেন্দর আর মস্তানাকে গান

গাইতে হল। তার সঙ্গে সঙ্গত করলেন কিষেণ মহারাজ—ছুরি-কাঁটা-প্লেট দিয়ে। সব গানই রেকর্ড করা হল।

সন্ধ্যে সাতটার পর সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী একটি পার্টি দিলেন। উজবেকস্থানের প্রধানমন্ত্রীও সেই পার্টিতে এলেন। বক্তৃতার পর্ব শেষ করে খাওয়া-দাওয়া চলল অনেকক্ষণ ধরে। দুপক্ষের শিল্পীরাই মহানন্দে মিলেমিশে নাচগান করলেন।

বর্মা থেকে একদল চিকিৎসক এসেছিলেন সোভিয়েট সফরে। তাঁদের একজনের সঙ্গে এখানে আলাপ হল। ভদ্রলোকের নাম শেষনাদন। কথায়-কথায় তিনি বললেন, 'এরা আমাদের ভালো-ভালো অনেক জিনিস দেখাল বটে, তবে দেখাল না এমন জিনিসও অনেক আছে।'

আমি বললাম, 'দেখুন, অতিথি এলে এমন জিনিসই পরিবেশন করা উচিত যা তারা পছন্দ করবে। ভালো জিনিস যদি যথেষ্ট পাওয়া যায়, তাহলে কী-কী ভালো না লাগতে পারত তার তালিকা তৈরি করে লাভ কী?'

২.১০.৫৪। রাত একটার পর হোটেলে ফিরে দেড়-ঘণ্টার মধ্যেই বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে বিমানঘাঁটিতে পেঁছুতে হল। ফিরব সোজা মস্কোয়। পাঁচটায় প্লেন ছাড়বে।

এসে দেখি মুকারম তুরঘুনবাইভা এবং আরো অনেক শিল্পী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। উজবেক দেশের খঞ্জরীবাদক উঁচুদরের ওস্তাদ ভারত-প্রত্যাগত আনভার বারায়েভকেও সেই দলে দেখা গেল। মন্ত্রীর পার্টিতে সারাক্ষণ সঙ্গে থেকে এঁরা কখনো নাচ দেখিয়ে, কখনো গান গেয়ে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। এমনই অফুরন্ত তাঁদের উৎসাহ যে, এত রাত্রেও আবার তাঁরা দল বেঁধে বিমানঘাঁটিতে এসেছেন বিদায় জানাতে। বিমানের জন্যে আমাদের প্রতীক্ষার সময়টুকু নাচ-গান আর হাসি-তামাশা দিয়ে তাঁরা ভরিয়ে তুললেন।

চেয়ারে বসে আমাদের অনেকেরই ঘুমে চোখ বুজে আসছিল। কিন্তু এক-একটি নাচের পর হাততালির শব্দে চোখ না খুলে উপায় নেই। হঠাৎ দেখি গোপীনাথ, তারা, নদিয়া—ওঁদের নাচের দলে ভিড়ে পড়েছেন। উৎসাহ জিনিসটা কি রকম ছোঁয়াচে ওঁদের কাণ্ড দেখে তা বোঝা গেল।

উজবেক শিল্পীরা চেষ্টা করছেন ভারতীয় চালে নাচতে, আমাদের নাচিয়েরা চেষ্টা করছেন ওঁদের পদক্ষেপ, অঙ্গসঞ্চালন অনুসরণ করতে। দুইয়ে মিলে এক অদ্ভুত নৃত্য-পরিকল্পনার সৃষ্টি হল।

আবার মস্কোয়

বারো ঘণ্টায় মস্কো পেঁাছে গেলাম। এ বিমানঘাঁটি সোভিয়েটস্কায়া হোটেল থেকে অনেক দূরে। রবিশঙ্কর, আমি আর আলেকজান্দ্রিয়া একই গাড়িতে। লম্বা রাস্তা চলেছে, দু-পাশে ঘনবদ্ধ গাছ। দূরে মস্কোর প্রাসাদগুলো আবছা দেখা যাচ্ছে। নিজের শহরে ফিরে আলেকজান্দ্রিয়ার হাসি আর ধরে না। এতদিনে ভ্রমণপর্ব সেরে আমাদেরই মনে হচ্ছিল যেন ঘরে ফিরলাম। হোটেলে ফিরতেই চিঠি। দুটি বাড়ি থেকে, একটি ইংলণ্ড থেকে—ভ্রাতুষ্পুত্র অশোক লিখেছে।

আসবার সময় আমাদের বলা হয়েছিল, পাঁচ সপ্তাহেই সফর শেষ হবে। রবিশঙ্কর আর আমি তাই ঠিক করেছিলাম ইংলণ্ড, ফ্রান্স আর ইটালি ঘুরে দেশে ফিরব। অশোক লিখেছে, আমরা যাব শুনে লণ্ডনের ভারতীয়দের মধ্যে মহা উৎসাহ; তারা কয়েকটি জলসা করবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে।

কিন্তু এদিকে বিষম মুশকিল বাধল। সন্ধ্যাবেলায় দলের সভায় আমাদের নেত্রী জানালেন, পোল্যাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়ার আমন্ত্রণে আমাদের আরো কুড়িদিন ঐ দুই দেশে থাকতে হবে। এদিকে 'যদুভট্ট' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ শেষ করার জন্যে কলকাতায় দশ-বারো দিনের মধ্যেই আমার ফেরা দরকার। মিটিঙে কথাটা তুললাম। কোনো ফল হল না।

আজ গান্ধীজীর জন্মদিন। নিজেদের ঘরোয়া সভায় পট্টবর্ধনজী একটি ছোট্ট বক্তৃতা করলেন। সকলে সমস্বরে 'রঘুপতি রাঘব' গাওয়া হল।

৩.১০.৫৪। চেকভ্স্কি হল্-এ রিহার্সাল। চমৎকার হল্। বসবার দু-হাজার আসন ছাদ পর্যন্ত উঁচুতে বিচিত্রভাবে সাজানো। কন্সার্ট হল্, তাই না আছে পর্দা, না আছে উইং। ফলে অনেকক্ষণ ধরে রিহার্সাল দিতে হল।

জলসা চলল আটটা থেকে বারোটা। লম্বা প্রোগ্রাম করার ফল আজ হাতে-হাতে পাওয়া গেল। মধ্যবিরতির পর বেশ বোঝা গেল শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করেছে। আরম্ভের সময় যেখানে হল্-এর মধ্যে গিজগিজ করছিল লোক, মাঝখানে দেখা গেল বেশ কয়েকটি আসন খালি হয়ে গেছে।

মস্কোতে আজ এই প্রথম কিষেণ মহারাজ সোলো তবলা বাজালেন। ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, পরনে ধুতি পাঞ্জাবী; বাজাবার ভঙ্গিটিও বেশ আনন্দ-উচ্ছল। কাজেই খুব জমিয়ে দিতে পারেন। লেনিনগ্রাডে প্রথম তবলা বাজানোর পর রুশ সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল: 'ভারতের শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক বলে কিষেণ মহারাজকে তবলার রাজা বলা হয়।' রুশ সংবাদপত্রের এই আন্দাজ কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। তবে নবীন তবলা-বাদকদের মধ্যে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে খুব উঁচুতে। কিষেণের নামের 'মহারাজ'টুকুকে আশ্রয় করেই যে সাংবাদিকদের কল্পনা দৌড় দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দিল্লী থেকে বিমান ঘোষের একটি চিঠি আর লণ্ডন থেকে অশোকের তার পেলাম। থিয়েটারে বসেই অশোককে লিখে জানিয়ে দিলাম—এ যাত্রা আর ইংলণ্ড যাওয়া হল না।

৪.১০.৫৪। সকালটা কুয়াশায় ঢাকা। প্রাতরাশ সেরে সোজা রেডিও-স্টেশন। পুরোনো ধাঁচের বাড়ি। যে স্টুডিওর মধ্যে আমরা এসে বসলাম সেটা একটি হল্। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রকমারি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বাজনা। একটি মস্ত বড় টেলিভিশানের ক্যামেরা। একপাশে গোটা ছয়েক ডবল বেস্ যন্ত্র। একটি অতিকায় ব্যালালাইকার মতো যন্ত্র একপাশে শোয়ানো। সাজসজ্জায় পরিপাটি না হলেও উঁচুদরের স্থাপত্যের নিদর্শন প্রায় সব জায়গাতেই। স্টুডিওর দেয়ালের মাঝখানে-মাঝখানে উন্মুক্ত পাথরের ফলক—মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। এখানকার ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণের রীতিটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

আমাদের কিছু-কিছু গান-বাজনা রেকর্ড করা হল। স্টুডিওর সঙ্গে লাগানো রেকর্ডিং-এর কামরা। বাজনার মধ্যে নারায়ণস্বামীর বীণা, আমার একক তবলা, রবিশঙ্করের সেতার, শকুর খাঁর সারেঙ্গী আর

মীরা, সুরেন্দর কাউর আর পট্টবর্ধনজীর গানের রেকর্ড করা হল। এর পর আমাদের উঠে যেতে হল আর একটি স্টুডিওতে। দেয়ালগুলো তার যেন আগাগোড়া চারকোণা কাঠের থামের।

রাত্রে আবার জলসা। সময় সম্পর্কে একটু বাঁধাবাঁধি করার ফলে আজকের আসর অনেকটা ভালো জমল।

আজকের আসরে বড় ভালো হয়েছিল পণ্ডিত পট্টবর্ধনের গান। পণ্ডিতজী যে যুগের গায়ক, সে যুগ শেষ হতে চলেছে। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, পণ্ডিতজীর গায়কীর ওজস্বিতা, লয়ের উপর দখল এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব আজও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের নৃত্য-গীতের পালা আজ এখানেই সাঙ্গ হল।

হোটেলে ফিরে দেখি একটু ঘটা করেই সাপার-এর আয়োজন হয়েছে। যেসব রুশ কর্মী এতদিন আমাদের সুখ-সুবিধার জন্যে, আমাদের শিল্পকলা প্রদর্শনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছেন, তাঁরা সবাই উপস্থিত। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুধু এদিকে মীরা, সুরেন্দর, তারা, আর ওদিকে মাদাম তানিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া আর গ্যালা-কে।

ওদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে যখন আমরা শেষ পর্যন্ত টেবিলে বসে পড়বার উদ্যোগ-আয়োজন করছি, তখন দেখি মীরা, সুরেন্দর আর তারা আসছে। তাদের সঙ্গে শাড়ি-পরিহিতা চারজন মহিলা। কাছে আসতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল। মাদাম তানিয়া, অল্‌গা, আলেকজান্দ্রিয়া আর গ্যালা।

মাদাম তানিয়ার বয়স বছর পঞ্চাশ। শাড়িতে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছিল। তবে শাড়ি সামলাতেই তাঁর দম বেরিয়ে যাচ্ছিল। মাদাম তানিয়া ছিলেন আমাদের দলের এ্যানাউন্সার। যেমন ফিটফাট তেমনি চটপটে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের আগে তিনি দর্শকদের কাছে সারমর্মটি জানিয়ে দিতেন। সারা সফর এইভাবে তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে, যে-দেশে আমরা যাব—আমাদের আগেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে আগে থেকেই যাতে সব ব্যবস্থা তৈরি থাকে। এই বয়সেও

উৎসাহে তিনি তরুণীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন, আর তাঁর এই প্রাণ-চাঞ্চল্য কোথাও একটু বেমানান ঠেকে না।

টোস্ট উত্থাপন করে সবাইকেই আজ কিছু-না-কিছু বলতে হল। হিন্দী, বাংলা, তামিল, ইংরেজি—যে যে-ভাষায় পারে বলল এবং শেষ পর্যন্ত সমস্তই রুশভাষায় অনুবাদ করে শোনানো হল। ভারতীয় দূতাবাসের কাউল গড়গড় করে হিন্দী, ইংরেজি এবং রুশ বলতে পারেন। আমার পালা যখন এল, হেনরিয়েটার নাম না করে আমি বললাম—একটি জড়পদার্থের কাছে আমরা অনেকেই কৃতজ্ঞ থাকব, অলৌকিকভাবে যে আমাদের একাধিকবার এই ঠাণ্ডা দেশে রোগশয্যা থেকে টেনে তুলেছে—তার নাম মাস্টার্ড প্লাস্টার বা সর্ষের বেলেস্তারা।

'আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা'—এই পর্যন্ত বলেই মীরা হেসে ফেলল। আমার উপর ছিল তর্জমা করবার ভার। আমি তৎক্ষণাৎ তর্জমা করে বললাম, 'মাই ডিয়ার ব্রাদার্স এ্যাণ্ড সিস্টার্স—হা-হা হা-হা।' হল্সুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

খুব চমৎকার গুছিয়ে বললেন শ্রীমতী চন্দ্রশেখরণ।

উৎসব শেষ হতে চলেছে। কী রুশ, কী ভারতীয়—আসন্ন বিচ্ছেদে সকলেরই চোখে-মুখে বিষাদের ছায়া। ঘরে ফিরতে রাত দুটো বাজল।

৫.১০.৫৪। সকালে হেনরিয়েটার সঙ্গে হাসপাতালে গেলাম চোখ দেখাতে। এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জোরালো আলো প্রতিফলিত করে আমার চোখের ভিতরটা দেখলেন; আমার চশমার উপর হাতে করে লেন্স ধরে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, আগে হলে ডান-চোখটা বাঁচানো যেত, এখন তাঁরা নিরুপায়; বাঁ-চোখে যেটুকু কাজ চালাচ্ছি, চালিয়ে যেতে পারি। তবে বেশি ভারি জিনিস যেন কিছুতেই না তুলি।

লাঞ্চের পর ডক্টর সিংহ, মালিক এবং শ্রীমতী চন্দ্রশেখরণের সঙ্গে আমার তাড়াতাড়ি কলকাতা ফেরা নিয়ে আলোচনা হল। ও'রা বলে দিলেন সফর যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে আমাকে ও'রা ছাড়বেন না এবং এই মর্মে আমাদের ফিল্মের প্রযোজক মশাইয়ের কাছে একটি তারবার্তাও তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন।

রাত্রে বল্‌শইতে ব্যালে দেখতে গেলাম। 'সোয়ান লেক।' চেকভস্কি যে কত বড় সুরস্রষ্টা তা এর সঙ্গীতাংশ থেকে বোঝা যায়। ত্রিশ-বত্রিশটি মেয়ে রাজহংসীর ভূমিকায়—যেমন তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, তেমনি নিক্তির ওজনে মাপা তাদের দলবদ্ধ নাচ। শেষ অঙ্কের সঙ্গীতে আর নৃত্যে পাওয়া গেল এক স্বর্গীয় সুষমা। জাদুকরের জাদুমন্ত্রে মরালীরা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে—পাথরে খোদাই করা যেন এক বিরাট চিত্রপট। জাদুর হাত এড়িয়ে যখনই তারা নাচে, মনে হয় তারা শূন্যে ঘোরাফেরা করছে—যেন মাধ্যাকর্ষণের কোনো প্রভাবই নেই তাদের উপর। জাদুকরের প্রকাণ্ড পাখাওয়ালা সাজ, ঝড়ের বেগে মঞ্চে ঢুকে উদ্দাম নৃত্য, মৃত্যুর দৃশ্যে একটি ডানা খসে যাওয়া, একটিমাত্র ডানা নিয়ে ঝটাপটি করতে-করতে আছাড় খাওয়া, আর এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাল রেখে সঙ্গীত—এর পিছনে যে কত বড় ঐতিহ্য, কত বড় সাধনা আছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

তালমান বজায় রেখেও আমাদের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত যেমন তালের ঝোঁক-গুলোকে সব সময় সামনে আনে না, তেমনি এদের ব্যালে-নাচও সব সময় ছন্দের দোলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ না করে বেশির ভাগ সময় আত্মগোপন করেই চলে—অথচ তালমানের দিক দিয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে নাচের সঙ্গতি পুরোপুরি বজায় থাকে।

অনুষ্ঠানটির শেষে বল্‌শই-এর ডিরেক্টর আমাদের সাদরে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বল্‌শই থিয়েটারের পৌনে-দুশো বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব উপলক্ষে এখানকার কর্মীদের যে ব্যাজ দেওয়া হয়েছিল আমাদের প্রত্যেককে তিনি একটি করে দিলেন।

লোমনোসফ বিশ্ববিদ্যালয়

৬.১০.৫৪। আগের বার শুধু বাইরে থেকে দেখেছি, এবার তাই লোমনোসফ বিশ্ববিদ্যালয়টি আরো ভালো করে দেখবার জন্যে সকালে বেরিয়ে পড়লাম। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো এলাকা একটি আছে। এটি নতুন এলাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিরাট অংশটি তৈরি হয়েছে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে। এর নামকরণ করা হয়েছে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বহু-বিদ্যাবিশারদ লোমনোসফ-এর নামে।

কয়েকটি নিছক তথ্য রেখেছি। তা থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাটত্ব আঁচ করা যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা	২৬ লক্ষ কিউবিক মিটার
বাড়ির সংখ্যা	৩৭
সব চেয়ে উ'চু বাড়ি	উনচল্লিশতলা
বাড়ির উচ্চতা	প্রায় ৭৯০ ফ্ট
হল্	৪৫ হাজার
লিফ্ট্	১১৪টি
লেকচার রুম	১৬২
ল্যাবোরেটরী	১ হাজার ৭০০
মোট ছাত্র-ছাত্রী	২ লক্ষ ১৫ হাজার
স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী	১ হাজার ৬০০
আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী	৬ হাজার
অধ্যাপক	২ হাজার ৩০০
পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা	৪ কোটি ৫০ লক্ষ

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৯টি বিভিন্ন জাতির ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করছে। খবর নিয়ে জানলাম ভারতবর্ষ থেকে কেউ নেই।

প্রধান ইমারতের দোতলায় একটি সভাকক্ষে গিয়ে মনে হল, এ তো ছাত্রদের সভাকক্ষ নয়—ঘরের যা কারুকার্য আর সাজসজ্জা, তাতে শৌখিন সম্রাটদের রাজদরবার বলে ভুল হবে।

সবচেয়ে উ'চু বাড়িটির সর্বাঙ্গে শ্বেতপাথরের কাজ। ছাত্রদের একটি সাজানো-গোছানো কনসার্ট হল, একসঙ্গে সাতশোজন বসতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের ব্যায়মমূলক খেলাধূলা অবশ্য-শিক্ষণীয়। বক্সিং, ফেন্সিং এবং তাছাড়া জিমন্যাস্টিকের আলাদা-আলাদা হল্। বেশ কয়েকতলা উ'চুতে সাঁতার কাটবার একটি সুন্দর পুকুর। টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল ইত্যাদি খেলবার আলাদা ব্যবস্থা তো আছেই। সঙ্গীতের নানা অনুষ্ঠান হয়। তবে সঙ্গীত এখানকার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। সঙ্গীতশিক্ষার জন্যে আছে আলাদা প্রতিষ্ঠান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিজেদের একটি শৌখিন সার্কাসের দল আছে। পাঠাগারে বই আনা-নেওয়ার জন্যে বৈদ্যুতিক লিফট্-এর ব্যবস্থা।

ভূতত্ত্ববিভাগের খানিকটা ঘুরে দেখলাম। এই বিভাগে এগারোশো ছাত্র-ছাত্রী। এখানকার আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা খুশি হলে নিজেরাই রান্না করে খেতে পারে। তার জন্যে আলাদা রান্নাঘর, গ্যাসের উনুন সবই আছে। প্রত্যেক তলায় তিনটি করে রান্নাঘর, চারটি করে খাবারঘর এবং পঁয়ত্রিশটি জলযোগের ঘর আছে। এখানে রোজ প্রায় তেরো মণ রুটি লাগে।

ছাত্র-ছাত্রীরা যে-ঘরে থাকে তার একটা নমুনা দেখলাম। ঘর যে খুব বড়, তা নয়, তবে খুব সাজানো-গোছানো। এখানে খাওয়া-দাওয়া, থাকা এবং পড়বার খরচ—সমস্ত মিলিয়ে মাথা পিছু মাত্র পনেরো রুবল। ছাত্রদের জন্যে সেভিংস ব্যাংক, পোস্ট-আপিস, সব কিছুই আছে।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, হঠাৎ অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা। ভারতীয় ফিল্ম-প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে এসেছেন। বিমল রায়, দেবানন্দ, রাধু কর্মকার, সলিল চৌধুরী, হৃষি মুখোপাধ্যায় আমার ঘরে এলেন। একসঙ্গে এতগুলো দেশের লোক পেয়ে আনন্দে দু-বাক্স ক্রেভন-এ সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম।

বিদায়ের পালা

বিকেলে প্রেস কনফারেন্স। শ্রীমতী চন্দ্রশেখরণ যদিও সোভিয়েট দেশের প্রশংসা করেই একটি বিবৃতি পেশ করলেন, তাঁর কুণ্ঠিত ভাবটা ভালো লাগল না। নানা ব্যাপারে এতদিন ধরে তিনি যে-ভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, আজকের বিবৃতিতে তার বদলে উচ্ছ্বাস চাপবার চেষ্টাটাই প্রকট হয়ে উঠল।

সাংবাদিকরা ছাড়বার পাত্র নন। সোভিয়েট দেশের শিল্প-সংস্কৃতি ভারতীয়দের কাছে কেমন লেগেছে, ভারতবর্ষেই বা কতটা কী হচ্ছে—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাঁরা জানতে চান।

দলের নেত্রী বেগতিক বুঝে প্রথমে রবিশঙ্কর এবং তারপর মালিককে তুললেন। রবিশঙ্কর সংক্ষেপে সোভিয়েট শিল্পকলার যথার্থভাবে তারিফ করলেন। আমাদের দেশের শিল্প-সংস্কৃতির হালচালের কথা

বলতে গিয়ে মালিকের বক্তব্যে বেশ কিছুটা 'বনাবট' প্রকাশ পেল।

গ্রাম্য শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতির জন্যে আমাদের দেশে কি ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে—হঠাৎ সোজাসুজি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে শ্রীমতী চন্দ্রশেখরণ কাটা জবাব দিয়ে বললেন : এদেশের গ্রাম সম্পর্কে আমাদের যখন বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়নি, নিজেদের দেশের কথা নাই বা বললাম।

একটা গম্ভীর লৌকিকতার আবহাওয়ার মধ্যে প্রেস কনফারেন্স শেষ হল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

রাত দশটায় হোটেল মেট্রোপলিস-এ বিদায় ভোজ। ভারতীয় ফিল্ম-প্রতিনিধি-দলকেও বলা হয়েছে। রাজ কাপুর, নার্গিস, বিজয়ভাট, আব্বাস এবং আরো অনেকে এসেছেন। অনেক গণ্যমান্য অতিথির আজ শুভাগমন হয়েছে।

প্রথমে রুশ শিল্পীদের কনসার্ট, পুতুলনাচ এবং জিমন্যাস্টিক। পিয়ানো আর বেহালায় উচ্চাঙ্গের সোলো সঙ্গীত। একজন শিল্পী এমন আশ্চর্য ব্যালালাইকা বাজালেন যা চিরদিন মনে থাকবে। অতি দ্রুত লয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র অঙ্গুলিসঞ্চালনে তারের যন্ত্রে এমন সুরের মূর্ছনা তুললেন যে, আমরা যারা আজন্ম উঁচুদরের শিল্পীদের কাছে সেতার-সরোদ-বীণা শুনতে অভ্যস্ত—আমাদেরও অবাক মানতে হল। আমাদের সেতার কিম্বা সরোদ যখন অত্যন্ত দ্রুত লয়ে বাজানো হয় তখন একটা কোলাহলের মধ্যে শ্রুতিবিচ্যুতি ঘটে, স্বরমাধুর্য ব্যহত হয়। কিন্তু এই শিল্পী যখন ঝড়ের গতিতে ব্যালালাইকায় নানা কর্ড-এর সাহায্যে সুরলহরী তুলতে লাগলেন, প্রত্যেকটি মূর্ছনা স্বচ্ছ সুরের আলোয় ঝলমল করতে লাগল, কোনো স্বর অন্য কোনো স্বরের সঙ্গে কোনোরকম বিরোধিতা করল না।

পিয়ানোর তালে-তালে চলল জিমন্যাস্টিক। একজন বয়স্ক পালোয়ান এবং একজন মেয়ে অপূর্ব কসরত দেখালেন। দণ্ডায়মান পুরুষটির ফাঁক-করা পায়ের সামনে অল্প একটু দূরে শায়িত মেয়েটি একটি হাতের আঙুল দিয়ে পুরুষটির হাতের একটি আঙুল আঁকড়ে ধরে আছেন। পিয়ানো বেজে চলেছে; হঠাৎ পিয়ানোর দমকা ঝোঁকের সঙ্গে নিজের জায়গা থেকে একটু না সরে পুরুষটি এক হেঁচকা টানে মেয়েটিকে মাথার উপর এনে ফেললেন এবং দেখা গেল পুরুষটির উপরদিকে

সম্পূর্ণ বিস্তারিত একটি হাতের উপর মেয়েটি একটি হাত সোজা করে রেখে পীকক হয়ে আছে।

একজন বিখ্যাত পুতুলনাচ-শিল্পী কয়েকটি পুতুলের খেলা দেখালেন। শুনতে পুতুলনাচ, কিন্তু এ যে কী জিনিস যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের লিখে বোঝানো যায় না। ভদ্রলোক নিজে একটি দাঁড়-করানো পর্দার আড়াল থেকে একটি পুতুলকে দিয়ে এমন জীবন্ত তামাশার সৃষ্টি করলেন যে হাসতে-হাসতে সকলের দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল।

এর পর বুফে ডিনার। কাফটানভ বিদায় অভিভাষণ দিলেন; আমাদের দলের নেত্রী তার প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন। অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া-দাওয়া আর গল্পগুজব চলল। হোটেলে ফিরলাম রাত দুটোয়।

৭.১০.৫৪। আজ আমরা পোলান্ড রওয়ানা হব।

ব্রেকফাস্টের সময় ডেপুটি মিনিস্টার কাফটানভ এলেন। কয়েকবার টোস্ট, তারপর দুপক্ষের অল্প বক্তৃতা। বিদায়ের পালা ঘনিয়ে এসেছে। দুপক্ষই একটু ভাবালু হয়ে পড়েছেন দেখা গেল।

কাফটানভ আমাদের প্রত্যেককে একটি করে বারোশো রুবল দামের ক্যামেরা এবং এগারোশো রুবল দামের হাতঘড়ি উপহার দিলেন। তাছাড়া একগাদা করে ফোটোগ্রাফ। মেয়েদের খাতির সব জায়গাতেই একটু বেশি। তাই উপরি হিসেবে মেয়েরা পেলেন সুগন্ধি এবং আরো অনেক জিনিস।

আবহাওয়া ভালো নয়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া। বিমানঘাঁটিতে এসে অপেক্ষমান দুটি প্লেনে আমরা ভাগ হয়ে বসলাম। ভিক্টর ভ্লাডিমির, একদল ফোটোগ্রাফার, টাকমাথা তত্ত্বাবধায়ক, অল্‌গা, আলেকজান্দ্রিয়া, হের্নারিয়েটা, গ্যালা, বল্‌শই-এর ম্যানেজার—সবাই এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও দেখা করে বিদায় জানাতে এসেছে। একে ছিঁচকাদুনে বর্ষা, তার উপর বিদায়ের আবহাওয়া, দুপক্ষই খুব গম্ভীর, দুপক্ষই অশ্রুসজল। এসেছি তো কদিন মাত্র, আমাদের দেশ এক নয়, ভাষা এক নয়—অথচ আমরা দুপক্ষই পরস্পরকে ছেড়ে যেতে দারুণ কষ্ট পাচ্ছি। কোথাকার মানুষ কোথায় এসে নতুন

এক মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি। দেখলাম যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে ভৌগলিক দূরত্ব কোনো বাধাই নয়।

পোলাণ্ডের মাটিতে

মেঘলা আকাশের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। সকলেরই মন ভার হয়ে আছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে ক্বচিৎ কখনো নিচেকার দৃশ্য দেখা যায়। সোভিয়েট দেশের অসংখ্য স্মৃতি কেবলই ছবির মতো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। আনন্দমধুর সেই দিনগুলো পিছনে ফেলে যেতে সকলেরই কষ্ট হচ্ছিল।

ঘণ্টা দেড়েকের কিছু বেশি সময় লাগল মস্কো থেকে মিন্স্ক পেঁছুতে। বিকেলের চা-পর্ব সেরে আবার প্লেনে উঠতে হল।

বিমানঘাঁটিতে বসে যখন আমরা চা খাচ্ছি, তখন হঠাৎ একটা দুঃসংবাদ আমাদের কানে এল। দেশ থেকে নাকি মালিকসাহেবের পিতৃ-বিয়োগের খবর এসেছে। মালিকসাহেব আমাদের অনুষ্ঠান-পরিচালক্। তাঁর সরল অমায়িক ব্যবহারের জন্যে সবাই তাঁকে ভালোবাসত। আমরা উঠে গিয়ে সকলে মিলে তাঁকে গভীর সমবেদনা জানালাম। মালিকসাহেব ইচ্ছে করলে তখনই দেশে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানালেন, যে কাজের ভার তাঁর উপর আছে তা সম্পূর্ণ করে দলের সঙ্গেই তিনি ফিরবেন।

দুঘণ্টার ঢের কম সময়ে আমরা ওয়ারশ-তে পেঁছুলাম। প্লেন থেকে নেমে দুপক্ষের বক্তৃতা চলল কিছুক্ষণ। তারপর আমরা গিয়ে উঠলাম অরবিস হোটেলে। কিছুটা পুরোনো ধাঁচের হোটেল। অনেক ঘর আছে, যার সঙ্গে লাগানো বাথরুম নেই।

এখানে ঠাণ্ডা বড় জবর। খাবার বিদেশী হলেও চেনা-চেনা—আমাদের দেশে ইউরোপীয় খাবার যেমন হয়।

প্রৌঢ়া দোভাষিণী ইভ-এর সঙ্গে বাসেই আলাপ হয়েছিল। দোভাষিণী আলার সঙ্গে এবং জুরেক ও একজন বেতার-সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ জমল ডিনারের টেবিলে।

খেয়ে উঠে রবিশঙ্কর, মস্তানা আর আমি বেঞ্জামিনকে সঙ্গে নিয়ে

বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে শহর দেখতে। দারুণ ঠান্ডা। হনহন করে হেঁটেও মনে হচ্ছিল ঠান্ডায় বুঝি জমে যাব। আগাগোড়া ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা শহর। শহরটার বয়স কমপক্ষে সাত-আটশো বছর। গত যুদ্ধে গোটা শহর ভেঙে তছনছ হয়েছে।

৮.১০.৫৪। সকালে দল বেঁধে বাসে বেরোনো হল। যুদ্ধ যে মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে, এখানকার প্রকান্ড-প্রকান্ড বিধ্বস্ত বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে এখনো তার খানিকটা বোঝা যায়। গত যুদ্ধে এ শহরের প্রায় পনেরো আনা বাড়িই মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। চোদ্দ লক্ষ শহরবাসীর মধ্যে পাঁচ লক্ষ লোক খুন হয়েছিল। গত দশ বছরের চেষ্টায় আজ আবার সব নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আবার নতুন করে পৃথিবীতে যুদ্ধ যদি না বাধে, শহরে ভাঙা বাড়ির আর চিহ্নও থাকবে না।

এক জায়গায় এসে পড়লাম—তার নাম মার্কেট প্লেস। চারদিকে চার-পাঁচতলা উঁচু অনেক নতুন-নতুন বাড়ি। কোনোটা ইঁটের, কোনোটা প্যাথরের। দেখতে সবগুলো একরকম নয়। কিন্তু স্থাপত্যের মধ্যে একটা মিল আছে।

ভিসভা নদীর ধার দিয়ে যেতে-যেতে বড়-বড় বাড়ি দেখলাম—কোনোটার একপাশ, কোনোটার দুপাশ আবার কোনোটার বা চারদিক ভেঙে ধ্বসে পড়ছে। কোথাও-কোথাও নতুন পরিকল্পনায় নতুন-নতুন বাড়ি উঠছে।

দূর থেকে দেখলাম বিয়াল্লিশতলা উঁচু একটি প্রকান্ড প্রাসাদ উঠছে। অনেকটা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইমারতটির মতো। এটা হবে এদেশের সংস্কৃতি-প্রাসাদ। এর সমস্তটাই সোভিয়েট সরকারের দান। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েটের লাল ফৌজ এদেশকে জার্মান ফ্যাশিস্টদের কবল থেকে মুক্ত করেছিল, তার স্মৃতিতে এখানকার মানুষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি বিরাট বাগানের মধ্যে পাথরের ইমারত তুলেছে।

বিখ্যাত পোলিশ পিয়ানোবাদক ও সুরকার শোপ্যাঁর হৃৎপিন্ডটি প্যারিস থেকে এনে রাখা আছে একটি গির্জায়। সেই গির্জাটি আমরা দেখলাম। এখানকার মানুষদের মধ্যে ধর্মপ্রবণতা বেশ ব্যাপক। গির্জার সংখ্যা নেহাত কম নয়।

এখনো এখানে ষোলো আনা সমাজতন্ত্র নয়। ব্যক্তিবিশেষের হাতে অনেক ব্যবসা আছে। কিছু-কিছু বেসরকারী দোকানপাট আছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে অনেক বাড়িও আছে। তবে ব্যবসায়ীদের প্রচুর ট্যাক্স দিতে হয়। আর সরকার থেকে মোটেই এসব জিনিসকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আস্তে-আস্তে এসব জিনিস লুপ্ত হয়ে গিয়ে পুরোপুরি সমাজতন্ত্র কায়েম হবে—এই এখানকার লোকদের ধারণা।

শুনে আশ্চর্য হলাম এখানে নাকি পুলিশ নেই। সিভিল মিলিশিয়া বলে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, তারাই পুলিশের কাজ চালায়।

গত যুদ্ধে ওয়ারশ কি ভাবে ফ্যাশিস্ট জার্মানদের কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিল, তার বৃত্তান্ত শুনলাম জুরেক-এর মুখে।

জার্মানরা ওয়ারশ দখল করবার কিছুকাল পরে এদেশী ফ্যাশিস্টদের একটি দল সোভিয়েট লাল ফৌজের সঙ্গে কোনোরকম যুক্তি-পরামর্শ না করে জার্মান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিল। অথচ তখন নদীর ওপারেই ছিল কয়েক হাজার সোভিয়েট সৈন্য এবং কিছু পোলিশ সৈন্য। যখন তারা বিদ্রোহের খবর জানতে পারল, নদী পার হবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নদীর পুলটি বিধ্বস্ত হওয়ায় শহরে ঢুকে বিদ্রোহীদের সাহায্য করবার কোনো উপায় ছিল না। ফলে, বিদ্রোহীদের কয়েক হাজার ফৌজ জার্মানদের হাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর জার্মান ফ্যাশিস্টরা এত রেগে যায় যে, সমস্ত ওয়ারশ শহর তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে খাক করে দেয়। এত লোককে তারা নির্বিচারে খুন করে যে, শহরের লোকসংখ্যা চোদ্দ-লাখ থেকে কমে ন-লাখে এসে দাঁড়ায়।

দুপুরটা গেল অপেরা হাউসে। স্টেজ আলো আর প্ল্যাটফর্ম ঠিকঠাক করে নেওয়া হল। হল্‌টা মন্দ নয়। হাজার খানেক লোক ধরে।

খাওয়া-দাওয়ার পর এক সিনেমা ক্লাবে দল বেঁধে গেলাম ফরাসী ভাষায় তোলা শোপ্যাঁর জীবনচিত্র দেখতে। চিত্র গ্রহণ, শব্দ গ্রহণ, দৃশ্য-পরিকল্পনা কিম্বা পরিচালনা—কোনোটাই তেমন উঁচুদরের নয়।

রাত্রে সবে শুয়েছি, এমন সময় রবি ভাদুড়ী আমাদের ঘরে এসে হাজির। মস্কো দূতাবাস থেকে উনি আমাদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডে এসেছেন বেড়াতে। আমি আর রবিশঙ্কর উঠে বসলাম। তারপর কষে আড্ডা।

মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসের মর্যাদা, ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, কিছু বিদেশী রাষ্ট্রনীতির কথা, কিছু পরনিন্দা আর সব শেষে বাংলা সাহিত্য আর সঙ্গীতের কথা—কোনো বিষয়ই বাদ গেল না। পুরো দুঘণ্টা ভাদুড়ী মশাইয়ের সিগারেট ধ্বংস করে বারোটা নাগাদ শুয়ে পড়লাম।

৯.১০.৫৪। সন্ধ্যে সাতটায় আমাদের আসর। প্রেক্ষাগৃহ এমন ভাবে তৈরি যে তার মধ্যে মাইক্রোফোনের কোনো দরকার হয় না। মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হচ্ছিল শুধু বেতারে প্রচারের জন্যে। স্টেজ থেকে কিছু দূরে কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সেখানে সাজ ঘর। তার এক কোণে রেডিও-অপারেটার-এর জায়গা। আমাদের সাজপোশাক আর গানবাজনা সম্বন্ধে সাজঘরের পুরুষ আর মহিলা কর্মীদের মহা উৎসাহ। রবিশঙ্কর সেতারে একটু টুং-টাং করছিলেন; দোভাষিণী লিডিয়া অমনি সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যভঙ্গীতে খানিকটা সলজ্জভাবেই নাচতে শুরু করে দিলেন। সবাই খুব খুশি।

পোলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন। আমাদের শিল্পকলার খুব তারিফ করে গেলেন। আগ্রহ দেখে বোঝা গেল শ্রোতাদেরও মনে ধরেছে। জলসার পর মেয়েরা আমাদের প্রত্যেককে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। তিনটে বড়-বড় ফুলের সাজি স্টেজের উপর রাখা হল।

তারপর ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রশংসায় যে ছোট বক্তৃতাটি দেওয়া হল, তা শুনে বোঝা গেল এঁদের বিলক্ষণ মাত্রাজ্ঞান আছে।

শোপ্যাঁর জন্মস্থান

শোপ্যাঁর জন্মস্থান জেলাজোওয়া-উওলা। ওয়ারশ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের পথ। শোপ্যাঁ যে ঘরে জন্মেছিলেন সে ঘরটা দেখলাম। ছাদ বেশ নিচু। কড়িকাঠে নানারকম ফুল আঁকা। শোপ্যাঁর বাবা এক কাউণ্ট-এর কাছে চাকরি করতেন। এটা ছিল চাকুরেদের থাকার জন্যে সাবেককালের কটেজ ধরনের বাসাবাড়ি। বাড়ির চারদিকে প্রকৃতির আপন খেয়ালে বেড়ে-ওঠা ভারি সুন্দর একটি বাগান।

জায়গাটা এমনিতে নির্জন। কিন্তু রবিবারে বেজায় ভিড় হয়। খুব বেশি শীত না পড়লে কখনো-কখনো দর্শনকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় চার

হাজার। বিখ্যাত শিল্পীরা এখানে এসে শোপ্যাঁর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এক জায়গায় একটি ছোট্ট পুল। নিচে দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে। দুপাশে তার ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের সারি। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শোপ্যাঁ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পসৃষ্টির উপাদান।

একজন যুবক একটি ঘরের মধ্যে তন্ময় হয়ে পিয়ানোয় শোপ্যাঁর রচনা একের পর এক বাজিয়ে চলেছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শোপ্যাঁর নামে পিয়ানোর যে বিশ্ব-প্রতিযোগিতা হয়, তারই জন্যে সে তৈরি হচ্ছে।

দিনটা রবিবার হওয়ায় প্রচুর লোক এসেছে। বাগানের মধ্যে সারি-সারি নিঃশব্দে বসে তারা মুগ্ধ হয়ে যুবকটির আবেগময় বাজনা শুনছে। সুরের ইন্দ্রজাল-পাতা সেই আবহাওয়া বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদেরও আচ্ছন্ন করে রাখল।

শোপ্যাঁ যে ঘরে জন্মেছিলেন, সেখানে একটি পুরোনো ফরাসী পিয়ানো আছে। মৃত্যুর দুদিন আগেও শোপ্যাঁ সেই পিয়ানো বাজিয়ে-ছিলেন। তারপর আর সে পিয়ানোয় কেউ হাত দেয়নি। শুধু গতবার পোল্যাণ্ডের যে মেয়েটি পিয়ানোর বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে শোপ্যাঁ পুরস্কার পায়, সে শোপ্যাঁর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে এটি বাজিয়ে-ছিল।

এই ঘরে একটি কাঁচের বাক্সের মধ্যে শোপ্যাঁর বাঁ-হাতের একটি মডেল আছে। ছোট হাত, আঙুলগুলো ডগার দিকে সরু।

১৮১০ সালে শোপ্যাঁর জন্ম। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। বাগানে তাঁর একটি ছোট মামুলি মূর্তি আছে। জারদের আমলে ১৮৯৪ সালে তৈরি। একই সময়ে তৈরি পাথরের একটি সুন্দর মূর্তি ছিল ওয়ারশতে। গত যুদ্ধে জার্মানদের বোমায় শোপ্যাঁর সেই মূর্তিটি ভেঙে চুরমার হয়।

১১.১০.৫৪। সকালে সিনেমা ক্লাবে একটি ফিল্ম দেখলাম। গত যুদ্ধে কিভাবে হিটলারপন্থী জার্মানরা ওয়ারশ শহরকে ধূলিসাৎ করেছে, তার প্রামাণ্য চিত্র। বার্লিনের পতনের পর সেখান থেকে উদ্ধার করে আনা অনেক ফিল্ম এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ছবি দেখাবার পর বাসে করে আমরা বেরোলাম ধ্বংসস্তূপ দেখতে।

সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ছ-সালা পরিকল্পনায় কিভাবে নতুন-নতুন প্রাসাদ-তুল্য বাড়ি উঠছে তাও আমরা দেখলাম।

সোভিয়েটের দান ওয়ারশর বিরাট সংস্কৃতি-প্রাসাদ এবার কাছে থেকে দেখলাম। চারদিকে এখন ফাঁকা মাঠ। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে দুটি বড়-বড় পার্ক হবে। শিকড় সুদ্ধ তুলে এনে সেখানে লাগানো হবে চল্লিশ বছরের পুরোনো তেরোশো গাছ।

একটি কালো পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ দেখলাম। তার গায়ে খোদাই-করা একটি দৃশ্যে একজন ইহুদী নেতার প্রতিমূর্তি। গত যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। চারপাশে বিরাট এলাকা জুড়ে শুধু ভগ্নস্তূপ। জার্মানরা এখানে ছ-লক্ষ ইহুদীকে আটক করে রেখেছিল এবং দিনে দশ হাজার ইহুদীকে খুন হতে হত। বন্দীরা নিরুপায় হয়ে একদিন বিদ্রোহের চেষ্টা করায় তাদের সবাইকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। নিজের বিজয়স্তম্ভ তোলবার জন্যে পররাজ্যলোভী হিটলার সুইডেন থেকে যে কালো পাথর আনিয়ে ছিল, সেই পাথর দিয়েই দেশভক্তদের এই স্মৃতি-স্তম্ভটি গড়া হয়েছে। নিয়তির এমনি পরিহাস!

বিকেলে সংস্কৃতি দপ্তরের অভ্যর্থনা, সন্ধ্যেবেলা 'রোমিও জুলিয়েট' ব্যালে, তারপর পোজনানের উদ্দেশ্যে মাঝরাতে ট্রেনে ওঠা।

ছোট্ট শহর পোজনান

পোজনান-এ পেঁছুতে সকাল হল। ছোটখাট শহর, বেশ ঝকঝকে তকতকে। জার্মানীর সীমানা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। চা-পর্ব শেষ করে রাস্তায় বেরোলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বেশ লাগছিল হাঁটতে। ছোটদের জিনিসপত্র পাওয়া যায় এমন একটি দোকানে ঢুকলাম। একপাশে বাচ্চা-দের চুল কাটবার ব্যবস্থা। একদিকে কাঠের তৈরি শ্যুট-এর উপর একটি শিশুকে বার-বার বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর সে নির্ভয়ে সড়-সড় করে নিচে গড়িয়ে চলে আসছে। জিনিসপত্রের দোকানে এমন ব্যবস্থা হতে পারে আমাদের ধারণাই ছিল না।

ঘুরতে-ঘুরতে একটি মেডিকেল এ্যাকাডেমিতে গেলাম। পাথরের তৈরি বাড়ি। ঘর-দোর সব বড়-বড়। অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। একটি ঘরে তড়িৎ ও

পদার্থ বিজ্ঞান, একটি ঘরে শব্দ-বিজ্ঞান এবং একটি ঘরে দৃষ্টি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত রকমারি যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা গবেষণামূলক কাজকর্ম করছে দেখলাম। অঙ্কশাস্ত্রে আমেরিকার ডিগ্রীধারী বিক্রম সিং সব দেখেশুনে বললেন ওদের মান খুব উঁচু।

হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম বাদ্যযন্ত্রের একটি মিউজিয়াম দেখতে। এরকম মিউজিয়াম নাকি আর কোথাও নেই।

নানা দেশের নানা সময়ের রকমারি বাজনার নমুনা দেখলাম। সপ্তদশ শতাব্দীর সামরিক বাহিনীর পিতলের ফুঁকযন্ত্র। উনিশ শতকের পাদানওয়ালা অর্গান। একাধিক কাঁচের নল লাগানো করাঘাতে বাজাবার এক ধরনের যন্ত্র। আমাদের স্বরমণ্ডল বা অটো-হার্প-এর মতো পিয়ানোর এক সংস্করণ। উনিশ শতকের রকম-রকম পোলিশ ও বিলিতি পিয়ানো। অস্ট্রিয়ার খুদে পিয়ানো। পিয়ানোর প্রাচীনতর এক সংস্করণ দেয়ালে ঝোলানো। ১৬৩০ সালের একটি পোলিশ হারমোনিয়াম। আধুনিক চেলোর মতো দেখতে আঠারো শতকের একটি বাদ্যযন্ত্র। হার্পসিকর্ড, পোলিশ লিউট, দুমুখো ইতালীয় বেহালা, ১৮১৯ সালের তাঁতের তারওয়ালা হার্প—এমনি আরো কত কী। শোপ্যাঁর নামে উৎসর্গ-করা একটি ঘরে শোপ্যাঁর একটি ছোট গ্র্যান্ড পিয়ানো রয়েছে।

এর পর আমরা গেলাম হট্‌হাউস দেখতে। জায়গাটা রীতিমতো বড়। প্রত্যেকটি বিভাগে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কাঁচের ঘর। যেমন প্রশস্ত তেমনি উঁচু। এক-একরকম গাছের জন্যে এক-একরকমের আবহাওয়া চাই—তাই কোনো ঘর কম-বেশি ঠাণ্ডা, কোনো ঘর কম-বেশি গরম। ভারতীয় দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়াও কিছু-কিছু আছে। তাছাড়া নানারকমের ক্যাকটাস, পাম, অর্কিড তো আছেই। এক জায়গায় রয়েছে খুব সুন্দর বড়-বড় লাল মাছ। লালে আর রুপোলীতে মেশানো মাছও অনেক দেখলাম। চৌকো বাক্সের মতো একটি চৌবাচ্চায় শিঙ্গিমাছের মতো একরকমের শাদা-কালো মাছ দেখলাম, পাখনার জায়গায় চারটে পা, জলের নিচে গুড়ি মেরে চলেছে।

হট্‌হাউস থেকে বেরিয়ে বাচ্চাদের একটি প্রতিষ্ঠানে গেলাম কয়ার শুনতে। আমরা যেতেই নানা বয়সের শ-খানেক শিশু আমাদের অভি-

নন্দন জানিয়ে তিন-চারশো বছর আগেকার গির্জার একটি গান শুরু করে দিল। ভিন্ন-ভিন্ন সপ্তকে গলায় গলা মিলিয়ে তারা গাইল। সুরে-লয়ে যেমন সুসংবদ্ধ, তেমনি নির্ভুল। সাত-আট বছরের শিশুরাও নিজের-নিজের কাগজ দেখে দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে গান গাইছিল। বহু কণ্ঠে সমস্বরে গান গাইলে তার ধ্বনি মনের উপর গভীরভাবে দাগ কাটে। অথচ আমাদের দেশে আজও সমবেত সঙ্গীতের কোনো ব্যবস্থাই আমরা করে উঠতে পারলাম না।

রাত্রে আমরা একটি বিখ্যাত অপেরা দেখতে গেলাম। অপেরাটির নাম 'কারমেন'। হল্‌টি খুব প্রকাণ্ড না হলেও অদ্ভুত সুন্দর। গান, যন্ত্রসঙ্গীত, অভিনয় এতটা উঁচুদরের হবে আমরা ভাবতেই পারিনি। বিজেট-এর সঙ্গীত নাটকীয় উপাদানে এত উৎকৃষ্ট হতে পারে, নিজেরা না শুনলে বুঝতেই পারতাম না। 'কারমেন'-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন একজন হাঙ্গেরীয় মহিলা। এদেশে অপেরার মধ্যে সঙ্গীতের সুরের অংশই মুখ্য। একই অপেরার বিশেষ-বিশেষ গান, সুরের কোনো হেরফের না করেও বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া যেতে পারে। তাতে মূল সুরস্রষ্টার স্বর-রচনার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। 'কারমেন'-এর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করলেন সব গানই তিনি হাঙ্গেরীয় ভাষায় গাইলেন। একই সঙ্গে পোলিশ ভাষার গানের পাশাপাশি হাঙ্গেরীয় ভাষার গান শুনতে একটুও বেমানান লাগল না। সঙ্গীত, অভিনয় আর যন্ত্রানুষঙ্গ—এই তিনের বনিবনায় এক অখণ্ড রমণীয় রূপের সৃষ্টি হল।

এই অপেরার জায়গায়-জায়গায় সঙ্গীত আর যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে কথোপকথন, তর্ক-বিতর্ক, এমন কি ঝগড়া-কোঁদল পর্যন্ত এমনভাবে স্বাভাবিক অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে আমাদের দেশে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না।

অপেরার গোড়ায় আমাদের সাংস্কৃতিক দলের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করা মাত্র হল্‌সুদ্ধ লোক তুমুল করতালি দিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন।

১৩.১০.৫৪। অপেরা থিয়েটারে আজ আমাদের জলসা।

থিয়েটার হল্‌-এর সাজসজ্জায় একদিকে যেমন রুচিবোধের পরিচয়

আছে, তেমনি আছে প্রয়োজনীয় সব রকমের সাজসরঞ্জাম। স্টেজের চালে, দুটো পাশে এবং পৃষ্ঠপটে দামী মখমলের পর্দা। দর্শকদের বসবার আসনগুলো রাজদরবারে স্থান পাবার উপযুক্ত। আলোর সুব্যবস্থা তো আছেই। স্টেজের তিনদিকে লম্বা করিডোর-এর গায়ে সারি-সারি সাজঘর। প্রত্যেকটি সাজঘরে একাধিক আলমারি, আলো-লাগানো আয়না, জলের কল আর বেসিন।

জলসা খুব জমল। শহরের পক্ষ থেকে আমাদের অভিনন্দন জানানো হল। কিন্তু আমাদের নেত্রী এই প্রথম নীরব থেকে শুধু করমর্দন করে অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

আমরা যেখানেই গিয়েছি, জলসার শেষে একটা মজার ব্যাপার ঘটত। প্রেক্ষাগৃহের হাজার-দুহাজার শ্রোতা এবং স্টেজের উপরে দাঁড়ানো দু-পক্ষের সমস্ত লোক কিছুক্ষণ ধরে করতালি দিতে-দিতে হঠাৎ তার মধ্যে একটা ছন্দের সন্ধান পাওয়া যেত। তখন হলসুদ্ধ সবাই হাততালি দেবার সময় সেই ছন্দ অনুসরণ করতেন। খানিকক্ষণ এইভাবে চলবার পর ছন্দের কাটা-কাটা তাল ভাঙতে আরম্ভ করে আবার একটা বি-সম কর-তালির কোলাহলে পরিণত হত। কখনো-কখনো এ ব্যাপারটা বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলত।

ওয়ারশ ফেরবার জন্যে সেই রাত্রেই আমাদের ট্রেন ধরতে হল। পোজনান সকলেরই খুব ভালো লেগেছে। লোকজন, আদর-অভ্যর্থনা, শহর-হোটেল, স্টেজ-শো সব কিছুই।

আবার ওয়ারশ

১৪.১০.৫৪। সকালে ওয়ারশ পেঁছে চা-পর্ব সেরে আমরা গেলাম মাইল পনেরো দূরে একটি অ্সম্ব্ল্ দেখতে। চমৎকার গ্রামের আবহাওয়া। এখানে শৌখিন শিক্ষক তৈরি করবার জন্যে অর্কেস্ট্রা, সামুদায়িক সঙ্গীত ও নৃত্য শেখানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অনেকখানি জায়গা এবং অনেক-গুলো বাড়ি।

এখানকার পাঠক্রম তিন বছরের। এই সঙ্গে মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। নৃত্যগীত এবং সাধারণ শিক্ষা—দুটি বিষয়েই ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ১৯৪৫ সালে এখানে কাজ আরম্ভ হয়। তার আগে

এ-ধরনের প্রতিষ্ঠান এদেশে ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স মোটামুটি ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে।

এই প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ানের তত্ত্বাবধানে চলে। প্রতিযোগিতা মারফত ছাত্র-ছাত্রী বাছাই করা হয়। এখানকার সমস্ত খরচ ট্রেড ইউনিয়ান বহন করে। ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুই দিতে হয় না। একটি হল্‌-এ বসিয়ে আমাদের মোৎসার্ট-এর সিম্ফনি শোনানো হল। তাতে অংশ নিলেন ষাটজন যন্ত্রশিল্পী। সবাই ছাত্র। আর একটি হল্‌-এ কয়ার গান হল। একসঙ্গে আশীজন ছেলে-মেয়ে গলা মিলিয়ে গান গাইল। সঙ্গে বাজল এ্যাকর্ডিয়ান।

হল্‌টা মজার। দোতলায় অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো শ্রোতাদের আসন। নিচে হল্‌-এর মধ্যে সামনে পরিচালকেরা, তাদের মুখোমুখি স্টেজের উপর স্তরে-স্তরে গাইয়েদের সারি।

ব্যালের জন্যে প্রকাণ্ড আলাদা হল্‌। কাঠের মেঝে। নানারকম পোশাকে নাচিয়েরা তৈরিই ছিল। যেসব নাচ দেখলাম তাতে লালিত্যের চেয়ে বীরত্বের প্রকাশই বেশি। কথায়-কথায় পা ছোঁড়ে। পুরুষদের অনেকে এমন শক্তিমান যে মেয়েদের অনায়াসে শূন্যে তুলে ধরে চক্কর মারছিলেন। নাচের পর ছেলে-মেয়েরা পোল্যাণ্ডের পাঁচটি প্রদেশের বিচিত্র রঙচঙে পোশাকে সেজে এল। উৎসাহীদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে গোপীনাথ আর তারা ভারতীয় নৃত্যের নমুনা দেখালেন আর আশা সিংহ শোনালেন পাঞ্জাবী লোকসঙ্গীত। দেখে-শুনে সবাই তারিফ করল।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, অভ্যাস ও বসবাসের বিভাগগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখবার পর একটি নাতিপ্রশস্ত ঘরে গিয়ে আমরা বসলাম। কফি, কেক আর নানারকম ফল এল। খেতে-খেতে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলল। এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছু জানা গেল।

সন্ধ্যেবেলায় আমরা গেলাম মিউজিক কনজারভেটোয়ারে। অরবিস হোটেলের কাছেই। বৃদ্ধ ডিরেক্টার স্তানিস্ল জিপিনালস্কি চমৎকার ইংরেজী বলেন। ইংলণ্ডে ছিলেন অনেকদিন। শোপ্যাঁর সঙ্গীত-রচনার বিষয়ে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। আমাদের জলসার খুব প্রশংসা করলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের তালের ব্যাপারটি ওঁকে চমৎকৃত করেছে। বললেন, ভারতীয় সঙ্গীতের লয়কারী যে একটি দুরূহ বস্তু তা স্বীকার

করতেই হয়; একটার পর একটা ছন্দ এমনভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে যে, ভয় হয় এই বুঝি ছন্দের মূল নকশাটি হারিয়ে যায়। খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ওঁদের অনেক কিছু জানবার আছে। আমিও তাঁকে অকপটে জানালাম, এদেশের কণ্ঠ-অনুশীলন, নাট্যমঞ্চের কলাকৌশল, অর্কেস্ট্রা, কয়ার এবং আরো অনেক কিছুর মধ্যে আমাদের গ্রহণের উপযোগী জিনিস আছে। আমাদের তা নিতে হবে হুবহু অনুকরণ করে নয়, রীতি ও নীতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে।

চার বছরের মধ্যেই এ'রা একটি নতুন জমকালো বাড়িতে উঠে যাবেন। বর্তমানে চোদ্দটি কামরায় তিনশো ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা এবং গবেষণা করেন। এখানে শিক্ষণীয় বিশেষ উপপাত্তিক বিষয়—অর্কেস্ট্রা পরিচালনা, বেহালা, পিয়ানো ইত্যাদি অর্কেস্ট্রার অন্যান্য যন্ত্রসঙ্গীত। একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, যেখানে শব্দগ্রহণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। এ'রা মনে করেন, রেডিও-বিজ্ঞান ও সঙ্গীত একসঙ্গে শিক্ষা করলে রেকর্ড তৈরির কাজ আরো উন্নত হবে।

পোলিশ লোকসঙ্গীত

১৫.১০.৫৪। এখানকার সংস্কৃতি মন্ত্রীর দপ্তরে পাহাড়ী এলাকার শিল্পীদের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হল। প্রথমে তাঁরা ভারতীয় অতিথিদের উদ্দেশে একটি গান গাইলেন। সঙ্গে বেহালা আর চেলো বাজলেও তাতে ছিল পুরোনো গ্রাম্য সংস্কৃতির প্রকৃত ছাপ। চেলো আর বেহালার এক-ঘেয়ে গোঙানির সঙ্গে নানারকম খট-খট ঝম-ঝম আওয়াজ। বিচিত্র পোশাক পরে বীরবিক্রমে নাচলেন আর গাইলেন ত্রিশজন মেয়ে-পুরুষ। তার মধ্যে আর যাই থাক বা না থাক, প্রাণ ছিল। চেক সীমান্তের উ'চু পাহাড়ে তাঁদের বাস। মাত্র কয়েক পুরুষ আগেও স্বভাব-দুর্বৃত্ত বলে এ'দের পরিচয় ছিল।

হোটেলে ফেরবার পথে পরিখা-কাটা একটি জায়গায় নেমে বাদামী রঙের খুব বড়-বড় ভালুক দেখলাম।

আজ রাত্রে শেষ জলসা। রবিশঙ্কর, মস্তানা, মীরা, সুরেন্দর কাউর আর আমি কোরাসে একটি পোলিশ লোকগীতি গাইলাম।

গানের সুর কি রকমের ছিল, স্বরলিপিটা দেখলে বোঝা যাবে। গানটির ভাবার্থ এই :

১ তারপর সেই ছোট্ট মেয়ে সবুজ বনে গেল।
২ বনের মধ্যে দেখা পেল সুপুরুষ এক শিকারীর।
৩ মেয়েটি বলে, 'শিকারী ভাই, তোমায় দেখে খুশি হলাম।'
৪ শিকারী বলে, 'রুটি মাখন থাকলে দিতাম, খেয়ে ফেলেছি, নেই আর।'

সুরেন্দর আগে থেকে শিখে নিয়েছিল পোলিশ ভাষায় কি ভাবে ঘোষণা করতে হয়। শুনে শ্রোতার দল তো অবাক! গান শেষ হতেই আনন্দধ্বনিতে হল্ ফেটে পড়ল। হাততালির চোটে পর্দার বাইরে এসে আমাদের বার-বার অভিনন্দন গ্রহণ করতে হল।

১৬.১০.৫৪। সকালে যেতে হল পোলিশ বেতারকেন্দ্রে। ওঁরা আমাদের কিছু-কিছু গান-বাজনা রেকর্ড করে নেবেন। মীরা ঠুংরি গাইলেন। মস্তানা, সুরেন্দর, এমন কি নদীয়া সিং-ও গান করলেন। ডোরাইস্বামী আর বিজয়রাঘব বাঁশী বাজালেন। মালিক হঠাৎ এসে আমাকে ধরলেন, 'গান গাইতে হবে।' আমি বললাম, 'গাইতে বলেন গাইব, কিন্তু কমিক গান।' মালিক তাতেও রাজী।

কমিক গান আমি মোটেই গাই না। কিন্তু কী খেয়াল হল, গাইতে শুরু করে দিলাম। দোহার ছিলেন রবিশঙ্কর, মীরা আর সুরেন্দর। স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা'তে পাওয়া একটি গান। কথাগুলো যতদূর মনে পড়ছিল এই রকম:

ওরে ও চণ্ডীচরণ! তোমার কি নাইরে মরণ!
কোন সাহসে চাকর ডেকে ভদ্রলোকের কান মলাও?

হাজার-হাজার মাইল দূরে পোলিশ বেতারকেন্দ্রে বসে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের একজন সভ্য এই হাসির গান গাইছে ভাবতেই যেমন আমার তেমনি আর সকলেরই পেট ফেটে হাসি আসছিল। দোহারদের গানের সঙ্গে রবিশঙ্কর লয়ের কাজ করতে-করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে একটা বেয়াড়া ছন্দে বোলতান তুলে সামাল দেবার চেষ্টা করলেন।

	প্ — স	গ — র	স — ন্	স — ধ্
1	Shwa • djie	Ve ch ka	do • la	Se ch ka
2	Na • pot	ka • wa	mis • li	ve ch ka
3	Mis • li	ve ch ku	ko • ha	ne ch ku
4	Da • wa	bim • ci	hle • baz	ma s wem
	প্ — প্	গ্ — ম্	প্ — গ	স — —
1	Do • zie.	lo • ne	go • o	o • •
2	Ba rd zo	Shva r ne	go • o	o • •
3	Ba rd zom	ci • ra	da • ha	ha • •
4	A • lem	go • ziad	wa • ha	ha • •
	ম্ — ম্	র্ — গ্	ম্ — র	ন্ — —
1	Do • zie	lo • ne	go • o	o • •
2	Ba rd zo	Shva r ne	go • o	o • •
3	Ba rd zom	ci • ra	da • ha	ha • •
4	A • lem	go • ziad	wa • ha	ha • •
	প্ — প্	গ — র	স — —	— — —
1	Do • zie	lo • ne	go • •	• • •
2	Ba rd zo	Shva r ne	go • •	• • •
3	Ba rd zom	ci • ra	da • •	• • •
4	A • lem	go • ziad	wa • •	• • •
{	গ গর স	গ গর স	গ ম গ	র — —
	Trul lala la	la lala la	la la la	la • •
(	র রসা ন্	র রস ন্	র গ র	স — —)}
	Trul lala la	la lala la	la la la	la • •)
	ম গ র	স ন্ ধ্	প ধ ন্	স — —
	Trul la la	la la la	la la la	la • •

একে ভব্য পরিবেশের মধ্যে গম্ভীরভাবে হাসির গান পরিবেশনের চেষ্টা, তার উপর হঠাৎ এই মারাত্মক এবং অপ্রত্যাশিত লয়কারীর বাঁট—হো-হো করে হেসে ফেলি আর কি! তক্ষুনি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রবিশঙ্করের দল আমাকে খুব বাঁচিয়ে দিলেন। আবার এঁদের যখন সেই অবস্থা হয়, আমি ওঁদের হাসি থেকে উদ্ধার করে গান চালু রাখি। শেষ পর্যন্ত হাসির আবেগকে কান্নায় রূপান্তরিত করে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে আমরা গান শেষ করলাম। পোলিশ বেতারের কর্তৃপক্ষ অতশত বুঝলেন না। গানের খুব তারিফ করে বললেন, এমন অদ্ভুত স্বাভাবিক হাসির গান এর আগে কখনো তাঁরা শোনেননি।

রেডিও থেকে ফিরে হোটেলেরই একটি হল্-এ প্রেস কনফারেন্স। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল মোটামুটি এই রকম:

'মণিপুরী নাচ কি পুরোপুরি ভারতীয়? নাগানৃত্যে আফ্রিকার সঙ্গে মিল আছে বলে মনে হল!'

'পোল্যান্ডে কী কী ভালো লাগল?'

'দলনেত্রী এদেশে স্বাস্থ্যোন্নতির কী লক্ষ্য করলেন?'

'ভারতবাসীরা শোপ্যাঁর নাম জানে কি?'

'ভারতে ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র কি বাজানো হয়?'

'ভারতীয় সংস্কৃতির এই দলটি কি একটি সংগঠিত গোষ্ঠী, নাকি এর ভিতরে বিভিন্ন জায়গার শিল্পীদের একত্র করা হয়েছে?'

বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব দিলেন চন্দ্রশেখরণ এবং মালিক। এদেশের নাচ আর অর্কেস্ট্রা প্রশংসা করে রবিশঙ্কর একটি ছোট বক্তৃতা দিলেন। ভারতে ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আমাকে বিশদ ভাবে বলতে হল।

দুপুরে লাঞ্চ ছিল সংস্কৃতি দপ্তরে। কাছে বলে আমরা হেঁটেই গেলাম। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ভোজসভায় উপস্থিত। কয়েকটি টোস্টের সঙ্গে পরিমিত বক্তৃতা। দেখে মনেই হয় না এই বাড়িটা যুদ্ধের সময় ভেঙেচুরে গিয়েছিল। অনেকগুলো হল্। খুব জমকালো রাজকীয় সাজসজ্জা। একটি সুন্দর প্রকাণ্ড হল্-এ গানবাজনা শোনানো হল।

হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের প্রত্যেকের জন্যে এক গাদা উপহার। সংস্কৃতি দপ্তর থেকে পাঠিয়েছে।

তারপর চেকোশ্লোভাকিয়া। রাত দশটায় আমরা ট্রেনে উঠলাম। যাবো প্রাগ-এ।

পোল্যাণ্ডের মানুষ আমাদের কী আদরযত্নটাই না করেছে। জুরেক আর বেঞ্জামিন ওয়ারশতে থেকে গেল। আলা, ইভ, আর লিডিয়া চলল চেক সীমানা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিতে। ইভ মধ্যবয়স্কা হলেও কাজকর্মে খুব চটপটে। তেমনি তাঁর দরদী হৃদয়। গত যুদ্ধে জার্মান কন্সেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে তাঁকে চূড়ান্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচেন। কিন্তু আশ্চর্য, জার্মান জাতির বিরুদ্ধে ইভ-এর বিন্দুমাত্র ঘৃণা নেই। কথায় কথায় বললেন, কিছুদিন আগে জার্মানীর একদল খেলোয়াড় ওয়ারশতে এসেছিল। ওয়ারশর ধ্বংসের পর জার্মানদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করা সম্ভব কিনা জিগগেস করায়, ইভ বললেন, 'তা কেন? ওয়ারশ যারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তারা একদল সত্যিকার ফ্যাশিস্ট। তার জন্যে গোটা জার্মান জাতটাকে আমরা ঘৃণা করব কেন?'

১৭.১০.৫৪। যখন আমরা চেক সীমান্তে পেঁছিলাম, তখন রোদ্দুর উঠে গেছে। ছোট্ট স্টেশন। লোকজনের ভিড় নেই। একদল ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে আমাদের চেহারা দেখে কামরার কাছে এল। পোলিশ বন্ধুদের দেওয়া বিস্কুট আর চকোলেটের সাহায্যে আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন। ট্রেন ছাড়বার সময় হল। ইভ, আলা আর লিডিয়ার সঙ্গে এখান থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে। বিদায় দিতে-দিতে চোখ ছলছল করে তারা বললে, 'আবার এস।'

ট্রেন ছুটে চলেছে প্রাগ-এর দিকে। প্রাকৃতিক দৃশ্য আস্তে-আস্তে একেবারেই বদলে গেল। পোল্যাণ্ডের কোনো ছাপই তাতে নেই। বেশ বুঝলাম এক নতুন দেশে আমরা এসে পড়েছি। এখন আমরা চেকো-শ্লোভাকিয়ায়। মাঠ, খেত, পাহাড়, বন-জঙ্গল, দূরবিস্তৃত গাছের সারি, ফ্যাক্টরী—সব যেন পটে আঁকা। সবুজ আর সোনালীর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা।

বেলা দুটোর পর আমরা এসে পেঁছিলাম প্রাগ-এ। জাতীয় পতাকা-সজ্জিত একটি হল্-এ সরকারীভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে চেক প্রতিনিধি যে বক্তৃতাটি দিলেন, বিশুদ্ধ হিন্দীতে তার অনুবাদ করে শোনালেন চেক পণ্ডিত ডক্টর পোরিজকা। আমরা তো শুনে অবাক।

যে বাসে করে আমরা হোটেল এসপ্ল্যানেড-এ এসে উঠলাম, তার মাথায় উড়ছিল ভারতীয় পতাকা। বেশ ভালো হোটেল। ঘর অনেক। ছ-তলার উপরে আমার জন্যে যে ঘরটা বরাদ্দ হল, সে ঘরে আমি একা।

হোটেলের কাছেই একটা অপেরা হাউস। সন্ধ্যেবেলায় গেলাম বিখ্যাত 'বার্টর্ড ব্রাইড' দেখতে। অর্কেস্ট্রায় হার্প দেখলাম না। আমার পাশে বসে অপেরাটির মর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তরুণ দোভাষী ডক্টর কোটিক। এককালে তিনি সামূহিক কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা করতেন। আমেরিকায় লেখাপড়া করে বছর কয়েক হল দেশে ফিরেছেন। এখন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইওকেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করছেন।

দেখা-শোনা

১৮.১০.৫৪। সকালে সদলবলে শহর দেখতে বেরোনো হল। প্রথমে গেলাম সপ্তদশ শতাব্দীর একটি মঠে। কোষাগারে সোনার তৈরি হীরে-জহরত-বসানো গয়নাগাঁটি আর তৈজসপত্রের ছড়াছড়ি। ধর্মপ্রাণ যজমানদের দেওয়া গির্জায় ব্যবহারের জন্যে বহুমূল্য সোনা-রুপোর জিনিস, ছবি, কাস্কেট এবং আরো কত কী। পয়সাওয়ালা এক মেয়ে-ভক্ত তাঁর তৃতীয় বিবাহে ব্যবহার করা ছ-হাজার হীরা-বসানো পোশাকটি এই মঠে দান করেন। পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তা-লাগানো রত্ন-সিংহাসন, আর্চ-বিশপদের শিরোভূষণ এবং অন্যান্য অলঙ্কার দেখলাম। আলমারির মধ্যে আলো জ্বালাতেই বিচিত্র আকারের প্রকাণ্ড একটি সুন্দর মনস্ট্রান্স আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ওর মধ্যে আছে প্রায় হাজার ভরি সোনা আর ছ-হাজার দুশো বাইশটি হীরা। ওর গায়ে মেরী মাতার জীবনের প্রধান-প্রধান ঘটনা কারুকার্যে খোদাই করা আছে। মঠের প্রাঙ্গণে একটি গির্জার চূড়ায় সাতাশটি ঘণ্টার সুরে একটি বিশেষ ধর্মসঙ্গীত বাজে। একটি ধর্মমন্দিরে পুরোনো আমলের ধার্মিক মহাপুরুষদের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। প্রাগ-এ গির্জার সংখ্যা কম নয়। তার মধ্যে বেশির ভাগ ক্যাথলিক।

প্রেসিডেণ্ট যে বাড়িতে থাকেন, সেটা বেশ উঁচুতে খোলা জায়গার উপর। চারদিকের পাথর-বাঁধানো রাস্তা থেকে গোটা শহরটা দেখা যায়। সাড়ে-তিনশো বছরের পুরোনো মস্ত একটি হল্ আছে। প্রত্যেক বছর

দেশের সেরা কর্মীদের সেখানে সম্মানিত করা হয়। বিরাট ঝাড়-লণ্ঠনগুলো খোদাই-করা কাঠের। প্রথম প্রেসিডেণ্ট অট্ওয়াল্ডকে এই হল্এর মধ্যেই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে অন্তিমশয্যায় শায়িত করা হয়।

ক্যাথিড্রাল যে এত বড় হতে পারে, পাথরের তৈরি সেণ্ট ভাইটাস ক্যাথিড্রাল দেখবার আগে ভাবতেই পারিনি। ভিতরে আলো আসবার জন্যে বিরাট-বিরাট কাঁচের জানলা। তার উপর অধ্যাপক জাবিনস্কির স্বহস্ত-রচিত কাঁচের মোজেইক-এর অপূর্ব রঙিন চিত্রাবলী। ছ-শো বছরের পুরোনো এই ক্যাথিড্রাল-এ বোহিমিয়ার অনেক রাজার সমাধি আছে। আর আছে সেণ্ট জন-এর সমাধি। ধনভাণ্ডারে যাবার দরজায় সাতটি বড়-বড় তালা।

একটি বড় কাষ্ঠফলকের উপর তিনশো বছর আগেকার এক শিল্পীর খোদাই করা প্রাগ শহরের ছবি।

রাত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ধরমবীরের বাড়িতে বড়ুয়ার হাতের খাঁটি স্বদেশী রান্না খেলাম। লুচি-মাংস তো বটেই, ক্ষীর পর্যন্ত ছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। তার মধ্যে শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা রায়কে অনেকদিন মনে থাকবে। শ্রীযুক্তা রায় একদিন অতি উপাদেয় রসোগোল্লা তৈরি করে খাইয়ে ছিলেন।

১৯.১০.৫৪। দুপুরে চলচ্চিত্র কেন্দ্রে কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর ছবি দেখলাম। একটি ছবিতে পুতুলরাই হল কুশীলব। অথচ অভিনয় ঠিক জীবন্তের মতো। আরেকটি দেখলাম রঙিন স্বপ্নরাজ্যের ছবি। পাত্র-পাত্রী, দৃশ্য—সব কিছুই কাঁচ দিয়ে তৈরি। এ জিনিস যে চলচ্চিত্রে সম্ভব, আগে আমাদের ধারণাই ছিল না।

সন্ধ্যায় সংস্কৃতিমন্ত্রীর ভোজসভা। স্থানীয় গণ্যমান্যেরা ছাড়াও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় ফিল্ম-প্রতিনিধিদলের অনেকে। স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে অনেকে দেখলাম হিন্দী বলতে পারেন। বিশ বছরের একটি মেয়েকে থেমে-থেমে হিন্দী আর বাংলা বলতে শুনলাম। অনেক সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীতস্রষ্টা এসেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে মাতিচেক-এর সঙ্গে আলাপ হল। রবিশঙ্কর আর আমাকে তিনি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন তাঁদের সঙ্গীত-রচয়িতাদের

ক্লাবে গিয়ে যেন একদিন ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি।

ভোজসভায় কয়েকজন নামকরা শিল্পী ক্লাসিক ও লোকসঙ্গীত শোনালেন।

এখানে যে বকশিশ দেবার প্রথা আজও চলেছে ক্লোকরুম-এ ওভার-কোট নিতে গিয়ে টের পেলাম। সঙ্গে ভাগ্যিস শ্রীযুক্তা রায় ছিলেন, নইলে আমরা বড্ড লজ্জায় পড়তাম। অবশ্য শ্রীযুক্তা রায় আমাদের ঋণী করে রেখে কম লজ্জায় ফেললেন না।

২০.১০.৫৪। একটি ফ্যাক্টরী-ক্রেশে বা নার্সারি দেখতে গেলাম। মোটে দেড়-দুবছর হল তৈরি হয়েছে। এখানে পঁয়তাল্লিশটি শিশুর তত্ত্বাবধান করা হয়। গোটা দেশে পঁয়তাল্লিশ হাজার শিশুর উপযুক্ত ক্রেশে আছে।

ক্রেশে দেখার পর আমরা একটি প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। প্রদর্শনীর শিরোনামায় লেখা—'জীবন মৃত্যুকে জয় করে।' প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি কিভাবে ধাপে-ধাপে এগিয়েছে—ছবি, মডেল ও বৈদ্যুতিক উপকরণসহ তারই সচিত্র ইতিহাস। কাঁচের তৈরি এবং ভিতরে বৈদ্যুতিক বাতিযুক্ত মানুষের শরীরের মডেল দেখে সত্যিই আমরা অবাক হলাম।

তারপর গেলাম একটি পুতুলনাচের থিয়েটারে। গত লড়াইয়ের আগে এদেশে পুতুলনাচের কোনো পেশাদার দলই ছিল না। এখন এগারোটি থিয়েটার আছে যেখানে শুধু পুতুলনাচ হয়। টিকিটের দাম কম বলে সব সময় সব থিয়েটারেই হাউস ফুল্। পুতুলনাচের প্রসার-প্রতিপত্তির পিছনে যাঁর দান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন অধ্যাপক স্কুপার।

আমরা যে থিয়েটারটিতে গেলাম, এ-রাষ্ট্রে তা উচ্চ পুরস্কার-প্রাপ্ত। পুতুলদের দিয়ে অভিনয় করাবার জন্যে সাধারণত পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ-জন শিল্পী লাগে। বছরে প্রায় আড়াইশো করে শো হয় এবং দু-তিনটে নতুন পালা যোগ হয়। এক-একটি পালা মঞ্চস্থ করতে চার মাস সময় লাগে।

থিয়েটারে পেঁাছে শুনলাম সেদিনকার শো তক্ষুনি শেষ হয়েছে। আরম্ভের সময় সম্পর্কে যে খবরটা আমরা পেয়েছিলাম, দুঃখের বিষয় তাতে ভুল ছিল। আমরা এসেছি শুনে থিয়েটারের কর্তারা আদর

আপ্যায়ন করে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। স্টেজের ভিতরে প্ল্যাটফর্মের নিচে থেকে কিভাবে পুতুলদের উ'চু করে ধরে চলানো-ফেরানো, নড়ানো-চড়ানো এবং জীবন্ত প্রাণীরা যা-যা করে তা করানো হয়—সব বিশদ ভাবে দেখালেন। স্টেজের নিচে কত বিচিত্র চরিত্রের যে পুতুল, কী বাস্তব যে তাদের অভিব্যক্তি, তাদের অঙ্গসঞ্চালন—না দেখলে ধারণাই করা যায় না। যে জায়গায় এই সমস্ত পুতুল, তাদের মুখের ছাঁচ, সাজ-পোশাক ইত্যাদি তৈরি হয়, সে জায়গাটাও আমরা ঘুরে দেখলাম।

ভারতীয় দূতাবাসের এ্যাটাশে শ্রীযুক্ত রায়ের বাড়িতে রবিশঙ্কর, মীরা আর আমার রসোগোল্লা খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। হোটেলে ফিরেই আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরোলাম। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সব রকম খাবার-দাবার অনায়াসে পাওয়া যায় না। রায় পরিবারের জন্যে হল্যান্ড থেকে বাক্সবন্দী ডিম আসে, ডেনমার্ক থেকে আসে চাল, মশলা আসে কিছু ভারতবর্ষ কিছু হল্যান্ড থেকে, জার্মানী থেকে আসে খেজুর।

স্মেটানা থিয়েটারে আজ রাত্রে আমাদের জলসা ভালোই হল। চেক আর শ্লোভাক গান দুটো খুব প্রশংসা পেল।

২১.১০.৫৪। রাস্তা থেকে আশী ফুট নিচে বিরাট লুসার্না হল্-এ রিহার্সাল। তিন হাজার লোক আসনে বসে আর পাঁচশো লোক মেঝেতে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দে শো দেখতে পারে। এখানেই প্রথম স্বয়ংচল লিফ্‌ট্ দেখলাম। টপ করে লাফিয়ে এই চলন্ত লিফ্‌ট্-এ উঠতে কিম্বা নামতে হয়।

রিহার্সাল শেষ করে গেলাম পাহাড়ের মতো একটি উ'চু জায়গায় চিড়িয়াখানা দেখতে। চড়াই-উতরাইয়ের পথ দিয়ে হাঁটতে বেশ লাগল। ডক্টর কোটিক টিকিট কেটে আমাদের ভিতরে ঢোকালেন। একটি পরিখা-কাটা খোলা পাথুরে জমিতে এই প্রথম দেখলাম পোলার বেয়ার—বিরাট আকারের শ্বেত ভাল্লুক। ভারতের বাঘ আর সাপ দেখেও আনন্দ হল। হাজার হোক আমরা তো একই দেশের।

রাত্রে জলসা। লুসার্না হলের মঞ্চে পর্দা নেই, চারদিক খোলা।

চেক গানটির স্বরলিপি:

প্‌ — গ — গ —	গ — — র স —
Oo • pa n ske •	ho • • dvo ra •
প — র — র গ	ম — — গ র —
Na sh vi • to u	She • • ko ra •
গ — গ — গ —	গ — ম — প —
Stra • ka • te •	vo • le ch kee •
র — — — — —	স — স — স —
Ma • • • • •	Ash • po • le •
স — — ন ধ —	ধ — প — প ধ
Do • • o ra •	Nam • ne • see •
প — — ম গ —	র — গ — ম —
Za • • vo la •	On • mne • Ush •
প্‌ — ধ্‌ — ন্‌ —	স্‌ — — — — —
Zda • le • ka •	Zna • • • • •

চেক গানটির তাৎপর্য:

আমাদের খেতে ভাইটাস লাঙ্গল চালাচ্ছে,
আর বলদের ছিট-ছিটা গা,
কাজের শেষে সে আমাকে ডাক দেবে;
অনেক দূর থেকেই সে আমাকে চিনবে।

শ্লোভাক গানটির স্বরলিপি :

জ্ঞ	—	র	—	প	—	ম	—	প	প	ম	জ্ঞ	র	—	স	—
O	m	re	m	o	m	rc	m	a	le	nie	bem	ke	•	di	•
জ্ঞ	—	র	—	প	—	ম	—	প	প	ম	জ্ঞ	র	—	স	—
A	•	kech	•	o	m	re	m	om	rem	ke	di	te	•	di	•
স	র	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	জ্ঞ	র	স	স	×	×	×	র	র	র	—
A	kech	om	rem	le	zach	boo	djiem	hope	•	soop	•	trul	lal	la	•
স	র	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	জ্ঞ	র	স	পা	×	পা	×	স	স	স	—
Tak	to	see	ya	spie	bach	boo	djem	hope	•	soop	•	trul	lal	la	•

শ্লোভাক গানটির তাৎপর্য :

আমি মরব-ই
কিন্তু কখন তা জানি না
তবে যখন মরব তখন মরবই
আর তখন গাইব—হোপ্ সুপ্ ট্রাল-লাল-লা।

জলসা আরম্ভ হবার আগেই চারদিকে স্পটলাইট জেবলে ফিল্ম তুলে নেওয়া হল এবং কিছু-কিছু গান-বাজনার অংশবিশেষ রেকর্ড করে নেওয়া হল।

খোলা স্টেজে জলসা আরম্ভ হল। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে। একটু শব্দ নেই। শিল্পীদের প্রতি এঁদের কী গভীর শ্রদ্ধা। আমি আজ তবলা সোলো বাজালাম। চেক ও শ্লোভাক গান আজও খুব তারিফ পেল।

২২.১০.৫৫। বেতারকেন্দ্রে সকালে রেকর্ডিং। রেকর্ড করলেন বিজয়-রাঘব, নারায়ণস্বামী, শকুর খাঁ, মীরা, সূর্য, মস্তানা আর রবিশঙ্কর।

সঙ্গে কোনো যন্ত্র ছাড়াই আমি সোলো তবলায় বাজালাম—দাদরা। মস্কোয় বাজিয়ে ছিলাম ঝাঁপতাল।

কথা দেওয়া ছিল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কম্পোজার্স ক্লাবে যাব। আর কারো গা নেই দেখে রবিশঙ্কর, মীরা আর আমি—এই তিনজনেই গেলাম। গিয়ে দেখি জন কুড়ি-পঁচিশ বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীত-রচয়িতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। সবাই বেশ বয়স্ক। ক্লাবের সভাপতি ভিক্লাভ ডোবিয়াস আমাদের স্বাগত জানালেন। ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবিশঙ্কর আর আমি এঁদের কাছে বললাম। উদাহরণ দেবার জন্যে মীরা খেয়াল, ঠুংরি, রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাল।

ধর্মের দেশ হিসেবে ভারতবর্ষের খ্যাতি থাকায় চেক শিল্পীদের অনেকেই কিছু ধর্মসঙ্গীত শুনতে চাইলেন। গোড়ায় যুৎসই গান মীরার ঠিক মনে পড়ছিল না। অগত্যা আমি যখন নিজেই জোড়াতালি দিয়ে একটা কীর্তন ধরবার উপক্রম করছি, তখন 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি' গানটা হঠাৎ মীরার মনে পড়ে গেল। কণ্ঠে ভক্তিরস আর আবেগ এনে গানটি মীরা ভারি সুন্দর করে গাইল। সভাস্থ গুণীদের উপর তার প্রভাব পড়েছে বোঝা গেল।

তারপর তবলা নিয়ে আমি ওঁদের কাছে ভারতীয় ছন্দের উদাহরণ দিলাম মুখে বোল পড়ে, হাতে বাজিয়ে এবং নানারকম ছন্দ বদল করে।

সব শেষে অল্প সময়ের মধ্যে আলাপ, জোড় এবং তবলা সহযোগে গৎ বাজিয়ে শোনালেন রবিশঙ্কর। মাঝে-মাঝে ব্যাখ্যাও করলেন। সঙ্গতের সময় সবাইকে বুঝিয়ে বলা হল কি ভাবে ত্রিতালের ষোলো মাত্রার ছন্দের আবৃত্তি ঘুরে-ঘুরে আসে, কি ভাবে যন্ত্রী বা গায়ক মাত্রার হিসেব রেখেও সুরের জাল বিস্তার করেন এবং কি ভাবে তবলাবাদক ও সঙ্গীতশিল্পী পারস্পরিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে আপন-আপন স্বল্প-কালীন বা দীর্ঘকালীন শিল্প-রচনা সমাপ্ত করে সমের মুখে এসে মিলিত হন।

আমরা সভাস্থ সবাইকে বললাম, 'আপনারা ক্রমান্বয়ে ষোলো মাত্রার এক-একটি পর্ব হাতে তাল দিয়ে গুণতে থাকুন, আমরা বাজিয়ে যাচ্ছি—দেখুন কেমন লাগে।'

রবিশঙ্করের তালের বিচিত্র ছন্দ, তবলার ধ্বনির সঙ্গে কখনো সমগতিতে মিলে, কখনো বিপরীত প্রতিঘাত সৃষ্টি করে কল্পনার নদী, সাগর, পর্বত ডিঙিয়ে যখন সমে এসে পড়ল, তখন বিপুল হর্ষধ্বনি করে সবাই করতালি দিয়ে উঠলেন।

সারা সফরের মধ্যে বিদেশের গুণী শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে ভাবের আদান-প্রদান করার এই একটিমাত্র সুযোগই আমরা পেয়েছিলাম। যাঁরা প্রোগ্রাম রচনা করেন, নৃত্যগীত পরিবেশনের ব্যাপার নিয়ে তাঁরা এত মশগুল থাকেন যে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর নিকট সম্পর্ক স্থাপনের কথা তাঁদের মনেই থাকে না।

রাত্রে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে সাড়ম্বরে মস্ত বড় পার্টি। আমাদের দল থেকে বাছাই করে কয়েকজনের নাচ-গান-বাজনার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু সবটাই যেন লোক-দেখানো। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অব্যবস্থার চূড়ান্ত। প্রোগ্রামে কারো নাম ছাপা হয়েছে কারো বা হয়নি। যেখানে জলসা হচ্ছে আর যেখানে শিল্পীরা জমা হবেন—দুটো দুমুড়োয়। যোগাযোগ রাখার কোনো বন্দোবস্ত নেই। দূতাবাসের কর্মীরা অতিথিদের খাওয়ানোর সময় সস্ত্রীক যথেষ্ট তৎপরতা দেখালেন, কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় তাঁরা বেবাক শ্রোতার ভূমিকা নিলেন। আর তাঁদের চোখের উপর দিয়েই মাত্র দুটো হাতে একাধিক তবলা, বাঁয়া, দুটো বিঁড়ে, হাতুড়ি, পাউডারের ডিবে সামলাতে-সামলাতে বার বার আমাকে উপরতলায় উঠতে হচ্ছিল আবার তড়িঘড়ি নিচের তলায় নামতে হচ্ছিল। ব্যাপারটা যে আদৌ ভালো দেখাচ্ছিল না, দর্শকের ভূমিকা নিয়েও তাঁরা তা বুঝলেন না। রবিশঙ্কর খুব ভালো বাজালেন। মেজাজ ভালো ছিল না বলে পট্টবর্ধনজী গাইলেন না।

ফেরবার সময় আমার পাশে এসে বসলেন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী-উর্দুর অধ্যাপক ডক্টর মাসুদ। বাসে যেতে-যেতে আমাকে বললেন, 'দেখুন, আমরা মাত্র চারজন ভারতীয় এখানে আছি। কিন্তু দূতাবাস আমাদের কোনো খবর দেয়নি। দেশের লোকদের সঙ্গে দেখা হবে বলে টেলিফোন করে নিজের গরজে এসেছি।' মাসুদ রুশভাষা জানেন। বললেন সোভিয়েটে আমাদের জলসা সম্বন্ধে সমস্ত লেখা উনি পড়েছেন। তার মধ্যে সাধারণ শ্রমিকদের লেখাও আছে। ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি

ওদের খুব ভালো লেগেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছে, তাঁরা বলেছেন ভারতীয় শিল্পের যতই তাঁরা সাক্ষাৎ পরিচয় পাচ্ছেন ততই যেন চোখের সামনে থেকে দুর্বোধ্যতার যবনিকা দূরে সরে যাচ্ছে। হোটেলে পেঁছুনো পর্যন্ত দেশ-বিদেশের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে মাসুদের সঙ্গে আলাপ হল।

হ্রাদেস ক্রালোভে আর ব্রুনোয়

২৩.১০.৫৪। সকালে চলেছি হ্রাদেস ক্রালোভে। চার ঘণ্টার পথ।

রাস্তায় দুটো কাট্‌গ্লাস-এর ফ্যাক্টরী দেখলাম। খুব ভালো লাগল। চেকোশ্লাভাকিয়ার কাট্‌গ্লাস জগৎবিখ্যাত।

গরম নরম কাঁচ (সাধারণ কাঁচ নয়) ফাঁপা নলের ডগায় লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নানারকমের পাত্র তৈরি হচ্ছে। মাঝে-মাঝে নলের সঙ্গে লাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে রঙিন ক্রিস্টাল কাঁচ। যতবারই কোনো বিশেষ গড়নের জিনিস তৈরি হচ্ছে, গড়ন আর মাপ হুবহু এক। যেন কারিগর নয়, জাদুকর এরা। কাঁচের উপর যারা নকশা কাটে, সরু-মোটা বিদ্যুত-চালিত চাকাগুলো যেন তাদের হাতে তুলির মতো কাজ করে। তাই দিয়ে সরু-মোটা দাগে তারা তাদের বাসনের উপর ফুটিয়ে তোলে নিজেদের মন থেকে আঁকা রকমারি ছবি।

হ্রাদেস ক্রালোভে এসে আমরা উঠলাম হোটেল বাইস্ত্রিকায়। যথারীতি সম্বর্ধনা। তারপর মালপত্র নিয়ে যে যার কামরায় গিয়ে ওঠা। হোটেলটি ছোট্ট হলেও সুন্দর।

আজ রাত্রেই আমাদের জলসা। স্টেজটা ছোট্ট, তবে আমাদের পক্ষে ভালোই। প্রোগ্রামও আমাদের ছোট্ট। চেক আর শ্লোভাক গান দুটো গাইতেই হাততালির ধুম পড়ে গেল।

জলসা শেষ হতেই একরাশ উপহার এসে গেল। কাট্‌গ্লাস-এর জিনিস, রুমাল, সুন্দর-সুন্দর পুতুল, আরো কত কী।

২০.১০.৫৪। প্রাতরাশের পর হ্রাদেস ক্রালোভ থেকে আমরা রওয়ানা হলাম। যাব ব্রুনোয়।

চমৎকার রাস্তা। কখনো উঁচু পাহাড়, কখনো দুপাশে পাইনের বন,

কখনো ছোট-ছোট গ্রাম। আমাদের বাসের পিছনে-পিছনে মালপত্র আর জলসার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চলেছে আর একটি লরি।

দুপুরে পৌঁছুলাম বুনোয়। সম্বর্ধনা বাদ পড়ল না। বাচ্চারা ফুল দিয়ে গেল। আমাদের নেত্রী বক্তৃতা দিয়ে-দিয়ে এতদিনে বুঝি ক্লান্ত হলেন—শুধু ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন।

লাঞ্চের পরই রওয়ানা হলাম স্ট্যাল্যাকটাইট গুহা দেখতে। বুনো থেকে মাইল চল্লিশ দূরে। পাহাড়ের নিচে একটি পান্থশালা। তার ঠিক পাশেই গুহামুখ। পথপ্রদর্শক সুইচ টিপে-টিপে আলো জ্বালিয়ে গুহার ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে চললেন। গুহার ভিতরটা কোথাও খুব সরু, কোথাও বেশ প্রশস্ত। কখনো নামতে হচ্ছে, কখনো উঠতে হচ্ছে। চারদিকে শাদা আইসক্রিম-এর মতো জমে আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। কোথাও ছোট-বড় শিবলিঙ্গের মতো জমি থেকে উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও মাথার উপর অগণিত সরু-সরু ঝুরির মতো ঝুলে আছে। খুব শক্ত পদার্থ, অথচ দেখে মনেই হয় না। স্ট্যাল্যাকটাইট-এর উপর বৈদ্যুতিক আলো পড়ে এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভিতরটা কনকনে ঠাণ্ডা, মাঝে-মাঝে উপর থেকে টিপটিপ করে জল পড়ছে। এক জায়গায় এসে সুইচ টিপতেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। আর সেই অন্ধকারে সামনের দিকে তাকাতেই দেখা গেল একফালি সূর্যের আলো। ক্রমে আমরা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। উঁচু পাহাড়ের গা দিয়ে একটি গহ্বর সমানে উপরের দিকে চলে গেছে। তার মাথায় গোল চাকতির মতো এক খণ্ড আকাশ।

আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট চলার পর যে জায়গায় এলাম সেখানে দেখি একটি নৌকো রয়েছে। বাকি পথটা যেতে হল নৌকোয়। গুহা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ঝুঁকে পড়ে মাথা বাঁচাতে হচ্ছে। নৌকো চলেছে কখনো সোজা, কখনো আস্তে-আস্তে গুহার বাঁক ধরে, উল্টোলেই বিপদ। নৌকোয় আমরা ষোলো-সতেরোজন, জল বরফের মতো ঠাণ্ডা তো বটেই তার উপর জায়গায়-জায়গায় একশো থেকে একশো-বিশ ফুট গভীর। সব মিলে যেন একটা স্বর্গরাজ্য। নৌকোয় করে গুহার শেষ প্রান্তে পৌঁছুতে প্রায় আধ-ঘণ্টা লাগল। গুহায় ঢুকবার পথ আর গুহা থেকে বেরোবার পথ যে এত কাছে ভাবতেই পারিনি।

সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। এদিকে আজ রাত্রেই জলসা। তাড়াতাড়ি ফিরতে হল। পাহাড়ের গায়ে রঙের খেলা। সোনালী, লালচে, হলদে, হলদেটে সবুজ, গাঢ় সবুজ, শাদা-শাদা, গোলাপী—পাতায় যে এত রকমের রঙ হয় জানা ছিল না।

গট্‌ওয়াল্‌দোভায়

২৫.১০.৫৪। প্রাতরাশের পর ব্রুনো থেকে আমরা একই বাসে রওয়ানা হলাম। এবার চলেছি গট্‌ওয়াল্‌দোভায়। ত্রিশ মাইলের উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তা। দুপাশে পাইনের জঙ্গল। কোথাও-কোথাও পপ্‌লার, বীচ, চেস্টনাট, আখরোট।

দুপুর নাগাদ গট্‌ওয়াল্‌দোভায় পোঁছুলাম। স্কাইস্ক্রেপার ধরনের বিরাট হোটেল।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে আলাপ করলেন। নাম কৃনিজ। বাঙলাদেশে তেরো বছর কাটিয়েছেন। কাজ করতেন বাটা কারখানায়। মতি খৈতানের নাম করলেন আর দেশে ফিরে সবাইকে নমস্কার জানাতে বললেন।

শহরটা খুব আধুনিক। হোটেলের নাম এখন মস্ক্‌ভা, আগে নাম ছিল হোটেল বাটা। ঘরের কার্পেট, গদি—সব কিছুর উপর বাটা কোম্পানির মার্কা-মারা আদ্যাক্ষর 'বি' লেখা। হোটেলের উপর থেকে শহরের অনেকখানি অবাধে দেখা যায়। কিছুটা দূরে সিনেমা হল্‌, তার ওপাশে বাটা কারখানার একাংশ, দূরে সবুজ পাহাড়।

শহরটির গোড়াপত্তন করেছিলেন বাটা। শহর জুড়ে ছিল জুতোর কারখানা আর শ্রমিকদের বসবাস। চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্রের দেশ হওয়ায় সব কিছুর উপর এখন রাষ্ট্রের মালিকানা। ফলে এখানকার কারখানা আর শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে।

জুতোর কারখানায় একটি বিভাগীয় স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের স্নানাগার এবং বাষ্পস্নান ও সংবাহনের ব্যবস্থা দেখলাম। এককালে বাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা যে বাড়িতে থাকতেন, তার একাংশের একটি বাগানে বিরাট সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেসব দম্পতিরা জুতোর কারখানায় কাজ করেন, এখানে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে আছে উন্নত ধরনের ক্রেশে। অসুস্থ শিশুদের জন্যে আলাদা কাঁচের ঘরের ব্যবস্থা।

তিন-কামরার একটি ফ্ল্যাট দেখলাম। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জুতোর কারখানায় কাজ করেন। তাঁদের মাথা-পিছু দু-তিন হাজার ক্রাউন রোজগার। ঘরের আসবাবপত্র, ঘর-দোর, পাকশালা সবই উঁচুদরের হোটেলের মতো। এই প্রতিষ্ঠানে এইরকমের এক-একটি ফ্ল্যাটে সন্তান নিয়ে বাস করেন একশোটি শ্রমিক দম্পতি।

রাস্তার দুপাশে শ্রমিকদের জন্যে নতুন তৈরি সুন্দর-সুন্দর ইট-রঙা বড়-বড় এ্যাপার্টমেণ্ট হাউস। যুদ্ধের আগে বাটার তৈরি পুরোনো ছোট-ছোট বাড়িগুলো আশেপাশে দেখা গেল।

কারখানা দেখতে গেলাম দল বেঁধে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আমাদের প্রত্যেককে ফুল উপহার দিলেন। তারপর অনেক ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকের পায়ের মাপ শেষ পর্যন্ত তাঁরা আদায় করে ছাড়লেন।

চব্বিশ-পঁচিশ হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করেন। কারখানার একটি বাড়ি ষোলোতলা। বাইরের দিকে দেয়ালের বদলে বড়-বড় কাঁচের জানলা। রাত্রে আলোয় বাড়িটা জ্বলজ্বল করে। আমরা তার দোতলায় বসে ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। বিশ ফুট চৌকো ঘর, আসবাবপত্রে ঠাসা। হঠাৎ আমার কেমন একটা মনে হল, আমরা স্থির হয়ে বসে নেই। মালিক সাহেবকে বলতে তিনি তো উড়িয়েই দিলেন। ডিরেক্টরকে বলতেই তিনি বললেন, 'ঠিক তো, আমরা উপরে ছাদে যাচ্ছি।' কয়েক মুহূর্ত পরে দরজা খুলতেই আমরা ছাদে এসে পড়লাম।

তারপর বনাতের বুট আর টপবুট-এর কারখানা দেখলাম। আর এক জায়গায় দেখলাম রবারের শুকতলা তৈরি হচ্ছে। হাতে সময় ছিল না বলে আর কিছু দেখা হল না।

সামনের কিনো সিনেমা হল্-এ রাত্রে আমাদের জলসা। প্রকাণ্ড হল্, শাদাসিধে একতলা, দু-হাজারের বেশি লোক ধরে। রফি আহমাদ কিদওয়াই-এর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে হল্-সুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। আজ আমার সোলো তবলা বাজানোর পালা ছিল।

জলসা শেষ করে ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘরে-ঘরে এক জোড়া করে নতুন উৎকৃষ্ট জুতো। প্রত্যেকে ডিনারের সময় আবার সুদৃশ্য একটি বাক্সে একটি ক্ষুদে রবারের জুতো আর একটি ছবির বই পেলাম।

হোটেলের প্রধান বাবুর্চি ভারতীয় রান্না শিখেছিল হায়দ্রাবাদের নিজাম আর ভূপালের নবাব পরিবারের বাবুর্চিদের কাছ থেকে—যখন তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় ছিলেন। খেতে বসে দেখি পরটা, ডাল, দৈ, টোমাটো, কপিভাজা—সমস্তই সে রেঁধেছে খাঁটি ভারতীয় কায়দায়। হাততালি দিয়ে একবাক্যে আমরা তাকে সাবাস দিলাম।

ব্রাতিশ্লাভায়

২৬.১০.৫৪। সকাল নটায় একই বাসে আমরা রওয়ানা হলাম। প্রাগ থেকে শুরু করে তিনটি এলাকার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি—বোহিমিয়া, মোরাভিয়া আর শ্লোভাকিয়া। মোরাভিয়া এলাকার শেষের দিকের পরিবেশটা কম পরিচ্ছন্ন বলে মনে হল। দু-একটা কাদামাখা অলিগলিও যেন চোখে পড়ল। তারপর শ্লোভাক এলাকায় এসে আবার সেই আদিগন্ত শ্যামলিমা। এক জায়গায় একটা কুয়ো আর লাটাখাম্বা দেখে খুব মজা লাগল। দুশো মাইল পথ পাঁচ ঘণ্টায় পাড়ি দিয়ে আমরা ব্রাতিশ্লাভায় পেঁছে গেলাম। শহরের লোকসংখ্যা আড়াই লাখ। যে হোটেলে আমরা এসে উঠলাম, তার নাম 'স্যাভয়।'

লাঞ্চের পর মাইল বারো দূরে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান দেখতে গেলাম—নাম 'স্লুক।' নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হল। অর্কেস্ট্রায় লোক-সঙ্গীতের উপযোগী বাদ্যযন্ত্র ছিল। যেমন দুহাতে কাঠি দিয়ে বাজাতে হয় এমন একটি বড় তারওয়ালা বাজনা; খানিকটা নিজস্ব স্বরবৈশিষ্ট্য থাকলেও তাতে পিয়ানোর অভাব অনেকাংশে পূরণ হয়। অর্কেস্ট্রায় ছিল গোটা বারো বেহালা, তাছাড়া ক্লারিওনেট, চেলো, বেস্ ইত্যাদি। বাজনা উঁচুদরের কিন্তু লোকসঙ্গীতকে পুরোপুরি হার্মনির ছাঁচে ঢেলে ফেলায় তাতে দেহাতী ভাব কম। বুখারেস্ট-এ বেহালায় প্রথম-পুরস্কার-পাওয়া এখানকারই শিক্ষানবিশ একটি ছেলে স্বরচিত কনসারটোর মতো জিনিস বাজালো। স্ট্যাকাটো অংশগুলি সে বাজালো বিদ্যুৎগতিতে। কিন্তু সুরের আস্বাদ এখনো সে পায়নি।

অনুষ্ঠানের পর চায়ের টেবিলে শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ হল। এই প্রতিষ্ঠানে শিল্পী আছেন একশো-বিশজন। এখানেই তাঁরা থাকেন এবং নতুন-নতুন শিল্পসৃষ্টির সাধনা করেন। ছাত্রছাত্রীরা খুব মিশুক।

হোটেলের কাছেই অপেরা-থিয়েটার। 'রুসালকা' দেখতে গেলাম। এক জলপরীর কাহিনী। চমৎকার সঙ্গীত। স্টেজের কারিকুরিও বিস্ময়কর। দেখে মনে হল সত্যিই জলের নিচে একদল পরী নাচছে। শেষ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা স্টেজের উপর বসে থাকতে-থাকতেই আস্তে-আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল, শুধু জ্বলজ্বল করতে থাকল নায়িকার মাথার একটি তারা।

খুব ঠান্ডা পড়েছে। থিয়েটার থেকে হোটেল—এইটুকু পথ আসতেই মনে হল যেন জমে যাচ্ছি। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি ডিনার-টেবিলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঝোলানো ডজন আষ্টেক জ্বলন্ত ফুলঝুরি। চারদিকে মোমবাতি। আজ দেওয়ালি—এই খবরটা কী করে যেন তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলেন।

২৭.১০.৫৪। একটি নতুন বাসে করে বেড়াতে বেরোলাম। একরাশ সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের উপর পাথর দিয়ে বাঁধানো যে চত্বরটায় এসে পেঁছিলাম—সেটা একটি সমাধিস্থান। চারপাশে ফুলগাছের সারি দেওয়া চারটি বেদী। যে ছ-হাজার সোভিয়েট সৈন্য এবং তাঁদের অফিসাররা এই অঞ্চলটিকে ফ্যাসিস্টদের কবলমুক্ত করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন—এখানে তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছিল। পাথরের গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা তাঁদের নাম।

ড্যানিয়ুব নদীর ওপার দেখা যাচ্ছে। দশ মাইল গেলেই অস্ট্রিয়া। শহরটা কী সুন্দর। কিন্তু শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি আমরা।

একটি ফিল্মস্টুডিওতে নানারকমের রঙিন ডকুমেণ্টারি ছবি দেখলাম। পাহাড়, বরফ, ঝরনা, মেঘ। গাছপালা, নানা জাতের ফুল, কুঁড়ি থেকে ফুল হওয়া—এই সমস্ত বিষয়ের মন-মুগ্ধ-করা ফটোগ্রাফি। ছবি তোলার কী কৌশল! ঈগল পাখি তার বাসায় উড়ে আসছে, আবার সেখান থেকে উড়ে চলেছে দূর থেকে দূরে মন্ডলাকারে। কিন্তু ছবি একটানা চলছে কোথাও কাট্ নেই।

রাত্রে জলসায় আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে নানারকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিল। ডিনারে শ্লোভাকিয়ার কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই এসেছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া একটি অভিন্ন রাষ্ট্র হলেও শ্লোভাকিয়ার ভাষা আলাদা, সংস্কৃতিও এক নয়। রাষ্ট্রপতি একজন হলেও দুই দেশের রাষ্ট্রনীতির

মধ্যে কিছুটা নাকি তারতম্য আছে। এ তথ্য আমাদের জানাই ছিল না।

প্রাগ থেকে বিদায়

২৮.১০.৫৪। এরোপ্লেনে প্রাগ্-এ পেঁছুতে দেড়-ঘণ্টাও লাগল না।

সন্ধ্যেবেলা জলসা সেরে রাষ্ট্রদূত শ্রীধর্মবীরের বাড়িতে চললাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এবারেও দেশী খাবারের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। একজন উচ্চপদস্থ চেক কর্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। 'দো-বিঘা-জমিন'-এর তিনি খুব প্রশংসা করলেন। ছবিটি সোভিয়েট ইউনিয়নেও শিল্প-বিচারকদের প্রশংসা পেয়েছে।

ভদ্রমহিলা বললেন ছবিটির করুণ কাহিনী তাঁর মনে এমন বেদনার ছাপ ফেলেছিল যে বাড়ি ফিরে সারারাত তিনি ঘুমোতে পারেননি।

২৯.১০.৫৪। ভোরবেলায় উঠে মালপত্র বেঁধে তৈরি হয়ে নিচে নামলাম। হোটেলে ঢুকতেই কিউরিওর দোকান। রবিশঙ্কর আগে থেকেই সোনালী কাজ-করা পাথর-বসানো আর মিনার কাজ-করা সুগন্ধি রাখবার কাঁচের সুন্দর-সুন্দর ছোট শিশি পছন্দ করে রেখেছিলেন। আমার কাছে ক্রনিন ছিল না, বিলিতি পাউন্ড-এই কাজ চলে গেল। খানকয়েক কিনে ফেললাম।

বিমানঘাঁটিতে অনেকেই এসেছিলেন। শ্রীধর্মবীর সপরিবারে। চেক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ভারপ্রাপ্ত হয়ে এসেছিলেন ডক্টর ক্রাসা। তাছাড়া এসেছিলেন ডক্টর কোটিক, ম্যাটিচেক, ডক্টর ফিশার, মারকোভা, অ্যানা এবং আরো অনেকে। এঁদের আন্তরিকতা দেখে অকপটভাবে একটা কথা মনে এল—নিজের দেশে আমরা কি বিদেশী বন্ধুদের এমন আপনার করে নিতে পারি?

প্লেন ছাড়ল সাড়ে-দশটায়। চমৎকার আবহাওয়া। বড় সুইস প্লেন। প্রত্যেক সারিতে পাঁচটি করে আসন।

আমাদের জন্যে বিমানটিকে খানিকটা ঘুরিয়ে এ্যাল্প্স পর্বত-মালার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এ্যাল্প্স পার হতে সময় লাগল এক ঘণ্টারও বেশি। বরফ-ঢাকা শাদা-শাদা অসংখ্য চূড়া—কখনো আমাদের নিচে, কখনো পাশে। কখনো-কখনো এত কাছে যে মনে হয়

হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। মাঝে-মাঝে পাথরের গায়ের দানাগুলোও যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বারোটা-চল্লিশে পৌঁছলাম জেনিভায়। এয়ারপোর্টে অনেকক্ষণ সময় লাগল। হাতে-হাতে দু-একদিনের ব্যবহারের মতো জিনিস নিয়ে আমরা 'দে-ফ্যামিলে' হোটেলে গিয়ে উঠলাম। আমার বরাতে সাততলার ঘর পড়ল।

সন্ধ্যে নাগাদ শহর দেখতে বেরোলাম। রাস্তার দুপাশে ব্যবহারযোগ্য এবং শৌখিন জিনিসের পশরা সাজিয়ে সারি-সারি দোকান। দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। আমরাও না-দেখে এবং না-কিনে থাকতে পারলাম না। নানারকম বৈদ্যুতিক ও কলকব্জার রকমারি জিনিস দেখলাম, আমাদের দেশে কোথাও যা দেখা যায় না।

৩০.১০.৫৪। সকালে উঠেই আবার কেনাকাটার ধুম পড়ে গেল। এক-একজন যে কবার করে মুদ্রাবিনিময়ের আফিসে চেক ভাঙালো, তার আর হিসেব রইল না। নানারকমের ঘড়ি কেনার আগ্রহই সকলের মধ্যে বেশি দেখা গেল। জিনিস ধরাতে জায়গার টান পড়ায় নব্বই ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে আমাকে একটা ক্যানভাসের স্যুটকেস কিনে নিতে হল। এয়ারপোর্টে পৌঁছেও সমানে কেনাকাটা চলতে লাগল। দু-একটা ছোটখাট জিনিস ছাড়া আমি পাঁচ পাউন্ড দিয়ে একটি দাড়ি কামাবার যন্ত্র কিনলাম— ঘড়ির মতো দম দিয়ে চালালে একটি ব্লেড-এর পাখা ঘুরতে থাকে, তাই দিয়ে দাড়ি কামানো হয়।

এয়ার-ইণ্ডিয়ার কনস্টেলেশান প্লেন। তবে সুপার কনস্টেলেশান নয়। পাঁচটা-চল্লিশে জেনিভার মাটি ছাড়লাম। আকাশের অবস্থা সুবিধার নয়। একঘণ্টা ধরে প্লেন দুলতে-দুলতে চলল। রাত একটায় কায়রোয় পৌঁছে দেড়-ঘণ্টার মধ্যেই প্লেন আবার আকাশে উঠল।

৩১.১০.৫৪। সকাল হলেও নিচে জনমানব গাছপালা কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু বালির সমুদ্র। অদূরে বালি গিয়ে জলের সঙ্গে মিশেছে, অথচ দিগন্তরেখা বহুদূরে। সেখানেও মেঘের পাহাড়। বালি যেখানে অস্পষ্ট হয়ে ধোঁয়াটে আকাশ কিম্বা নীলাভ জলের সঙ্গে মিশেছে সেখানেও

রোদ্দুর চিকচিক করছে। এক-এক সময় মনে হচ্ছে শাদা মেঘের পাহাড়। মেঘের পাহাড় ছাড়া আশেপাশে কোথাও উঁচু কিছু নেই। অদ্ভুত দৃশ্য আরব মরুভূমির।

সকাল সাতটায় নামলাম বাহেরিন দ্বীপে। এখানকার শাসনকর্তা একজন শেখ। এখানে পেট্রোলের খনি আছে। বেজায় শুকনো দেশ, গরমও তেমনি।

এবার চললাম ইরানের উপর দিয়ে। নিচে ধু-ধু করছে মরুভূমি, নীল সমুদ্র আর পাথুরে পাহাড়। লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

আর কিছুক্ষণ পরেই বোম্বাইয়ের কূল দেখতে পাব। ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছি। অধীরতা যত বাড়ছে ততই একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চলেছি।

হঠাৎ অসাবধানে জ্বলন্ত সিগারেটটা হাত থেকে পড়ে গেল। পড়ল দেয়াল ঘেঁষে আমার বসবার আসনের তলায়। পড়লে নিশ্চয় কার্পেটের উপর পড়বে। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে হাত বাড়ালাম। পেলাম না। আবার খুঁজলাম। পেলাম না। এখন উপায়? যদি কোনো দাহ্য বস্তুতে লেগে প্লেনের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড হয়? আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু এ-কথা কাকেই বা বলি! শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম। চোখ দুটো চরকির মতো ঘুরতে লাগল—দেখা যাক কোথাও ধোঁয়া উঠছে কি না। নাক খাড়া করে রাখলাম—কোথাও পোড়া গন্ধ পাওয়া যায় কি না।

বোম্বাই পৌঁছানো পর্যন্ত জ্বলন্ত প্লেনের ভূপাতিত হওয়ার নানা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

ছটা বাজতে পাঁচে প্লেন যখন বোম্বাইয়ের মাটি স্পর্শ করল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি ঠিক করলাম সোজা কলকাতায় যাব। দলের নেত্রীর সম্মতি পেলাম। আমার যে সমস্ত মালপত্র জেনিভা থেকে দিল্লী পৌঁছবে তার দায়িত্ব দলের সেক্রেটারী বহন করতে রাজী হলেন। কাস্টাম্‌স্‌-এর ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দিল্লীগামীদের বিদায় জানিয়ে রাত আটটায় কলকাতার প্লেনে উঠলাম।

দমদমে যখন পৌঁছলাম, রাত তখন পৌনে-বারোটা। মাটিতে পা দিয়ে বিমান-দুর্ঘটনায় আত্মহত্যার শপথটা তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করে নিলাম।

প্রায় আড়াই মাস পরে দেশে ফিরছি। যাবার সময় কত সমারোহ, অভিনন্দন আর আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। দেশে-দেশে কত বার্তা-বিজ্ঞপ্তি, কত লোক-জানাজানি। আজ যখন ঘরে ফিরছি এই মধ্য-রাত্রে আমি একা। আড়াই-মাসের দেশ-বিদেশের বিচিত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে আমি একা—নিকটতম প্রিয়জনেরাও জানেন না আমি এসেছি।

বাড়ি ফিরে কয়েকবার ডাকাডাকি করতেই মা ও পরিবারের অন্যান্য সবাই উঠে পড়লেন। মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙলেও মানুষ বিরক্ত না-হয়ে কত যে খুশি হয়, সে দৃশ্য দেখবার এক অপূর্ব সুযোগ পেয়ে গেলাম॥

[সমাপ্ত]

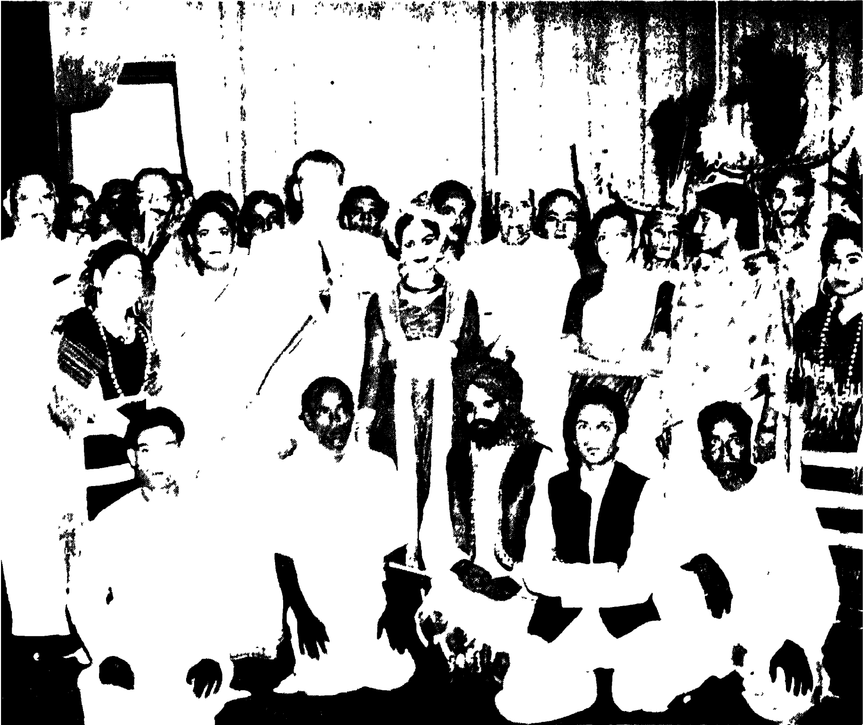
লেখকের অ্যালবাম থেকে

২৩খানা ছবি

দিল্লী শিক্ষাদপ্তরে

দেশ থেকে রওয়ানা হবার আগে প্রথম ভারতীয়

সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে শ্রীনেহরু ও রুশ রাষ্ট্রদূত





বলশই থিয়েটরের সামনে





৩ শিল্প-প্রদর্শনীর সুরম্য পরিবেশের মধ্যে

৪ শিল্প-প্রদর্শনীর প্রাসাদ



৫ বলশই থিয়েটরে



আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানের শেষে



৬ লেনিনগ্রাদের স্মল অপেরা থিয়েটর

৭ ক্রেমলিনের ভিতর মস্কোর বিখ্যাত ঘণ্টা





৮ হল্ অব্ কলাম্স্-এ



আশা সিং মস্তানা পাঞ্জাবী লোকগীত গাইছেন







৯ পিটারের উদ্যানে

১০ হার্মিটেজ আর্ট মিউজিয়মে

১১ শিশুমঙ্গল গবেষণাগারে

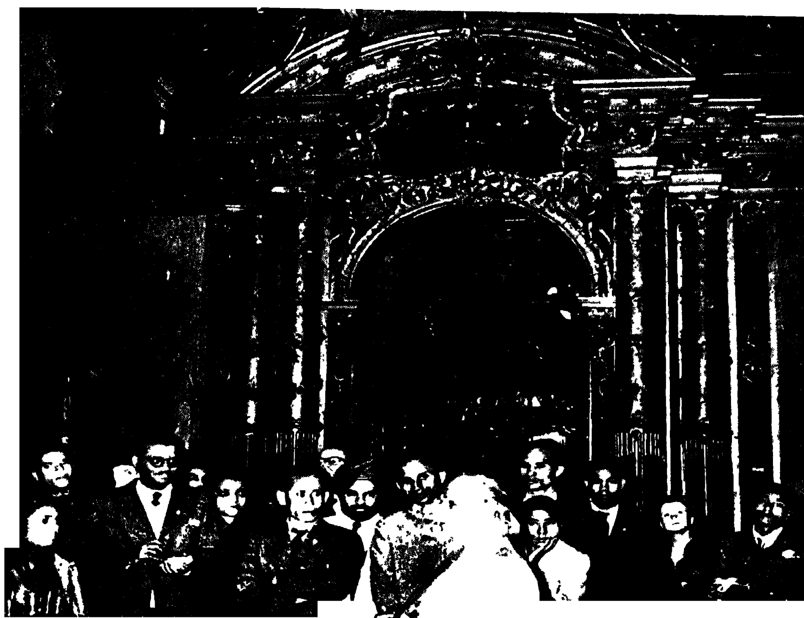


১২ লেনিনের কর্মস্থল স্মলনি

১৩ অভিনেতা চেবখাসব আমাদেব সঙ্গে রসালাপ করছেন









১৬

১৪ ক্যাথলিকদের নিকোলাস ক্যাথিড্রাল

১৫ ধর্মযাজক আমাদের সঙ্গে আলাপরত

১৬ সোচিতে শ্রমিকদের একটি স্বাস্থ্যাবাসে





১৭ ৎবিলিসি অপেরা থিয়েটারে জলসা দেখছি

১৮ ৎবিলিসির প্যালেস অব্ পাইওনিওর্স, কিশোরদের প্রতিষ্ঠান

১৯ তাসখন্দে এক থিয়েটর-প্রাসাদের কারুকার্য দেখছি







২০ তাসখন্দ থিয়েটর-প্রাসাদের আরেকটি দৃশ্য

১৯৫৪ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি যদি কেউ রেডিওতে পোল্যাণ্ড বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনে থাকেন তাহলে হঠাৎ ভারতীয় কণ্ঠে

ওরে ও চণ্ডীচরণ! তোমার কি নাইরে মরণ!
কোন্ সাহসে চাকর ডেকে ভদ্রলোকের কান মলাও?

সুকুমার রায়ের এই হাসির গানটি শুনতে পেয়ে নিশ্চয়ই চমকে গিয়েছিলেন। গেয়েছিলেন ভারতসরকার প্রেরিত সংস্কৃতিদলের সদস্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, যিনি বর্তমান গ্রন্থের লেখক। তাঁর সঙ্গে দোহার ছিলেন রবিশংকর, মীরা চট্টোপাধ্যায় আর সুরেন্দর কাউর।

পটবর্ধন প্রমুখ ভারতীয় সঙ্গীত আর নৃত্যশিল্পী নিয়ে গঠিত এই দলটি প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া, পরে পোল্যাণ্ড আর চেকোস্লোভাকিয়ার বহু বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহের জমকালো পরিবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেছিলেন। সেই সূত্রে ঐসব দেশের সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যকলার অনেক উৎকৃষ্ট অনুষ্ঠান এঁরা উপভোগ করেছেন এবং উৎসাহভরা নতুন দৃষ্টিতে দেশগুলিকে দেখে এসেছেন। বর্তমান গ্রন্থে লেখকের মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতার সাবলীল বর্ণনা পাওয়া যাবে।

কলকাতার একটি বিখ্যাত সঙ্গীতরসিক পরিবারে গ্রন্থকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের জন্ম। কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর আদি উৎসাহ পিতৃপিতামহের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। এবং স্বয়ং তিনি ভারতের এক প্রখ্যাত তবলাবিশারদ। রুশ-পোল-চেক সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রতি এই গ্রন্থে একটি অকৃত্রিম কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে।